Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা ইয়াছমিন

রোলঃ ২৩১০০১২০২৩৫

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা ইয়াছমিন

রোলঃ ২৩১০০১২০২৩৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কারবালার ইতিহাস " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা ইয়াছমিন, আইডিঃ ২৩১০০১২০২৩৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কারবালার ইতিহাস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

(স্বাক্ষর)

ফারজানা ইয়াছমিন

আইডিঃ ২৩১০০১২০২৩৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:..8
ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার যুগ :..8
বাইয়াতের জন্য প্রতিনিধিদের যাত্রা:..9
হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের বায়া ত কেন গ্রহণ করলেন না? 9
হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশৃঙ্খলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন? 10
ইয়াজিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুল :..10
হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে যুবাইর রা. আনহুর মদিনা ছেড়ে মক্কার পথে রওনা :..11
মদিনায় যাওয়ার পূর্বে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু এর সাক্ষাৎ :..12
মদিনার ধরপাকর, ওয়ালিদ ইবনে উতবার অপসারণ ও উমর ইবনে সাইদের নিয়োগ: .13
হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক যাওয়ার ইচ্ছা কেন করলেন?......................................13
বড়দের অধিকাংশ কেন ইয়াজিদের হাতে বাইয়াতে সন্তুষ্ট ছিলেন? 14
হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত ইবনে ওমর ইয়াজিদের বায়াতের ব্যাপারে কি বলেছিলেন? 15
ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কি কোন নম্রতা বা ছাড় প্রকাশ পাচ্ছিল? 16
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নামে ইয়াজিদের চিঠি:...17
ইরাকের চিঠি:..18
৬০ হিজরির কুফা :...18
কুচক্রি মহলের চক্রান্ত কি ছিল?..19
হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি ইবনে যুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহুর পরামর্শ :........20
মুসলিম ইবনে আকিলের কুফায় রওনা :..20
মুসলিম ইবনে আকিলের সাথে নুমান ইবনে বাশিরের সাক্ষাৎ :.....................................21

ইবনে আকিলের সন্তোষজনক পত্র প্রেরণ এবং হুসাইন রাদিআল্লাহুর সফরের দৃঢ় সংকল্প : 22
কুফায় অবস্থার পরিবর্তন এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের নিয়োগ:..........22
মুসলিম বিন আকিলের হত্যা :..........23
কুফা যাওয়া থেকে সাহাবীদের বারণ:..........23
চিঠি সাথে নিয়েছিলেন কেন? 24
ইয়াজিদকে হুসাইন (রা:) এর রওনা হওয়ার সংবাদ অবগত করা এবং ইবনে জিয়াদকে মারওয়ানের চিঠি প্রেরণ : 24
ইবনে জিয়াদের কাছে ইয়াজিদের চিঠি : 25
ইয়াজিদের চিঠির উপর কিছু বিশ্লেষণ ও বিবেচনা :..........25
হুসাইন(রা:) কে কুফার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখার জন্য ইবনে জিয়াদের অপচেষ্টা :..........26
হুসাইন (রা :) য়ের প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা এবং মুসলিম বিন আকিলের ভাইয়ের সামনে অগ্রসরের তাগিদ : 27
হুররা বিন ইয়াজিদের পরামর্শ, হুসাইন (রা :) এর দামেস্ক যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং তার কারণ :..........27
ইবনে জিয়াদ আসলে কি চাচ্ছিল এবং কেন?..........28
উমর ইবনে সা'দের কারবালায় রওনা:..........29
কারবালার বদ্ধভুমি: 29
কুফার সেনাদেরকে হুসাইন (রা:) এর তিনটি প্রস্তাব : 30
হুসাইন (রা:) কেন গ্রেফতার হতে রাজি ছিলেন না? 30
কিভাবে বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা?..........31
হুসাইন (রা :) এর অবমাননা :..........32
পুত্র আব্দুল্লাহর ইন্তেকাল ও যুদ্ধের সূচনা :..........32
কুফার অধিবাসীদের ভীরুতা :..........33

হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর শাহাদাত:......33
কারবালার শহীদগন :......34
হত্যাকারীদের হঠকারী কবিতা :......34
ইবনে জিয়াদের সামনে হুসাইন (রা:) এর মাথা :......35
উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে নবীপরিবারের নারীগণ:......35
যাইনুল আবেদীন ও আব্দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ :......36
ইয়াজিদের কাছে নবীপরিবারের নারীগণ :......36
যদি নবীজির জিজ্ঞেস করেন তাহলে কী উত্তর দেবে?......37
কারবালার ইতিহাস সম্পর্কিত হাদিস......38
কারবালার ইতিহাসের সম্পর্কিত আয়াত :......38
অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ :......38
আহলে বাইতের নবী পরিবারের মর্যাদা:......39
জুলুমের পরিনাম ও সত্যের বিজয় :......39
কারবালার দুর্ঘটনার দায় কার?......39
কুফার অধিবাসী :......40
আলী ভক্ত শিয়াদের মধ্যে যারা হুসাইন(রা :) এর হত্যার শরিক ছিল:......40
আমর ইবনে সাদ :......41
উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ :......42
কারবালার ঘটনা ও ইয়াজিদের কীর্তি :......42
এই সমস্যার সমাধান কী?......43
কারবালার ঘটনা: ইতিহাসের শিক্ষা......44
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:) এর এরশাদ :......45
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:)এর সত্য উচ্চারণ এবং ইয়াজিদের পক্ষ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরী :......45

ইয়াজিদের হাতে হুসাইন (রা :) এর পবিত্র মস্তক মোবারক বেয়াদবির শিকার হয়েছিল কী?......46
ইয়াজিদের সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:......47
হুসাইন (রা:) এর রক্ত কী হালাল ছিলো?......47
হুসাইন (রা:) য়ের কাফেলার জন্য করে পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? 48
শিয়ানে আলী সরকারি বাহিনীতে কিভাবে যোগদান করলো?......49
কারবালায় প্রেরিত বাহিনী কুফায় ছিলো নাকি সিরিয়া থেকে প্রেরিত?......49
ইয়াজিদের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীর বিদ্রোহ:......50
ইয়াজিদের কাছে মদিনার প্রবীণ ব্যক্তিদের আগমন : 51
ইয়াজিদের সময়কাল ও তার সারকথা :......52
উপসংহার :......54

ভূমিকা:

৬১ হিজরির ১০ মহররম ইরাকের কারবালা প্রান্তরে উমাইয়া খলিফা প্রথম ইয়াজিদ ও মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্র হুসাইন ইবনে আলী (রা.)-এর মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় অন্যায় ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার এই যুদ্ধে ইমাম হুসাইন (রা.) মাত্র ৭২ জন সঙ্গীসহ নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। নবীজির আদরের দুলাল প্রিয় নাতি। হজরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা য়ের চোখের মণি। খলিফায়ে রাশেদ আলী রাদিআল্লাহু আনহুর কলিজার টুকরা। জান্নাতি যুবকদের সর্দার। উম্মতের প্রিয় ভালোবাসার পাত্র। হজরত হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহুর মর্মান্তিক শাহাদেতের সাক্ষী। কারবালা প্রান্তরের সেই ঘটনা যা উম্মতে মুহাম্মদীকে যুগে যুগে কাঁদায়। দ্বিনের জন্য এবং আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা যুগায়।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন দলের প্রভাব ও বিস্তৃতি ঘটেছে। যার নাম শিয়া সম্প্রদায়। যারা উক্ত শাহাদেতের ঘটনাকে পুঁজি করে এমন গোষ্ঠী তৈরী করেছে যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করাকেই নিজেদের ধ্যান ও একমাত্র ধর্মসাধনা বানিয়েছে এক্ষেত্রে ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা এমনকি জাল ও বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনীর মাধ্যমে আদতে এক নাট্যমঞ্চ বানিয়েছে।

আহলে সুন্নতের অনুশারী অনেক আলেম উলামা পর্যন্ত তাঁদের রচিত এসব অখাদ্য ইতিহাস পড়ে বিভ্রান্ত হতে দেখা যায় মূলত এই কারণেই এই বিষয়ে কলম ধরতে উৎসাহ বোধ করছি।

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার যুগ :

হজরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর উত্তরাধিকার হলেন ৩৪ বছরের ইয়াজিদ। মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সময় সে ছিল হিমসের উপকণ্ঠবর্তী হাওয়ারিন দুর্গে। পিতার ইন্তেকালের এই দুঃসংবাদ শুনে দ্রুত রওনা হলেন খেলাফতের রাজধানীর উদ্দেশ্যে। তবে ততক্ষনে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর দাফন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। এরপর ইয়াজিদ দেশের নেতৃবর্গ এবং দামেশকের অধিবাসীদের সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক একটি পত্র লেখে -মুয়াবিয়া আল্লাহর একজন বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাকে খেলাফত

দারা সম্মানিত করেছেন এবং অনুগ্রহ করো শাসন কতৃত্ব দান করেছেন। তিনি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। তিনি পরবর্তীদের চেয়ে উত্তম আর পূর্ববর্তীদের চেয়ে নিম্ন স্তরে ছিলেন। আমি বলছি না যে, মাসুম ও নিষ্পাপ ছিলেন, রং তার আসল অবস্থা আল্লাহ তালাই ভালো জানেন যদি তিনি ক্ষমা পেয়ে থাকেন সেটা আল্লাহ তাআলারই দয়া ও অনুগ্রহে। আর যদি পাকড়াও হন তাহলে সেটা তার নিজের ভুলত্রুটির কারণে। তার ইন্তেকালের পর রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। তবে আমি এর জন্য নিজে থেকে চেষ্টা তদবির করিনি। আল্লাহর যা পছন্দ, তাই করেছেন। হায় আল্লাহর জিকির এবং ইস্তেগফার করায় উত্তম।

বাইয়াতের জন্য প্রতিনিধিদের যাত্রা:

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শেষ জীবনে নুমান বিন বাঁশির রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন কুফার গভর্নর। আব্দুল্লাহ বিন জিয়ার ছিলেন বসরার গভর্নর। আর মদিনার গভর্নর ছিলেন ওয়ালিদ বিন উকবা। ইয়াজিদ তাদের কাউকে অপসারণ না করে সকলকেই আপন দায়িত্বে বহাল রাখেন। এভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে করায়ত্ত করার পর সকল স্থানে মুয়াবিয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু সংবাদ জানানো এবং সবাইকে তার হাতে বায়াত করার জন্য প্রতিনিধিদের যাত্রা করার আদেশ দেন।

হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের বায়া ত কেন গ্রহণ করলেন না?

হযরত মুয়াবিয়ার রাঃ এর শাসনামলে হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অবস্থা ছিল এই যে পৈতৃক রাজত্ব থেকে দূরত্ব বজায় রেখে খেলাফায়ে রাশেদীনের যুগের আদলে শরীয়ত ভিত্তিক ব্যবস্থাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা ও উম্মতের নেতৃত্ব লাগাম উত্তম আর উত্তম কারো হাতে হস্তান্তর করা। ঠিক এই কারণেই তারা ইয়াজিদের হাতেও বায়াত হওয়ার থেকে বিরত

ছিলেন। অবশ্য ইয়াজদের হাতেও বায়াত হয়ে যাওয়াটা যদিও সময়ের দাবি ছিল কিন্তু উচিত এটাই ছিল যে পত্রিক রাজত্বের ধারাটা বন্ধ করে দেয়া।

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশৃঙ্খলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন?

বিক্ষিপ্ত কিছু আলামত দ্বারা এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর চিন্তাধারা প্রথমদিকে এমনই ছিল যে, নিজেদের মতাদর্শকে ভেতরে ভেতরে লালন করবেন এবং নীরব থাকবেন।সেই সাথে তাদের চিন্তাধারার বিপরীত কোন মত ও পথে পা বাড়াবেন না তবে এমন কোন সহি বর্ণনা পাওয়া যায় না, একথা প্রতিমান হয় যে তারা কোন বিশৃঙ্খলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।নয়তো হযরত মুয়াবিয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জীবদ্দশাতে কোথা থেকে প্রচুর চিঠি এসেছিল, যেগুলোতে তাদের শাসনভার গ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দেননি। এমনকি ইয়াজিদের রাজত্ব সত্বেও তিনি কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। বরং নিজের মতাদর্শ লালন করে মদিনাতেই থাকতে চেয়েছিলেন আজীবন। কিন্তু ইয়াজিদ যখন জোর জবরদস্তি করে তাদের থেকে বায়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। হলে কুফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া কোন পথ তার সামনে খোলা রইল না।

ইয়াজিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুল :

ইয়াজিদের জন্য উচিত এটাই ছিল যে, হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু কে তার বায়াত গ্রহণে বাধ্য না করা। হযরত আলী রাঃ এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলেও অনেকে বায়াত গ্রহণ না করলেও তিনি তাদেরকে বাধ্য করেননি হযরত মুয়াবিয়া রদিআল্লাহু আনহু ওসিয়াত ওসিয়ত করেছিলেন, কোন সম্মানিতো ব্যক্তির সাথে কঠোরতা করোনা নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাউকে বাধ্য করো না।

পিতার সেই ওসিহত তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। ইয়াজির সিংহাসনে আরোহন করেই হযরত মুয়াবিয়ার রাঃ আজাদকৃত গোলাম রুজাইকে মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে উতবার কাছে এই সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রঃ কে সে যেন দ্রুত তার কাছে ডাকে আর তাদের থেকে বায়াত নিয়ে নেয়।

বেঁধে মদিনায় যখন পৌঁছল তখন রাত হয়ে গিয়েছে।এরপর দারোয়ানের সাথে অনেক পীড়াপীড়ি করে গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে বুধবার সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ফরমানের কথা জানালো।

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে যুবাইর রা. আনহুর মদিনা ছেড়ে মক্কার পথে রওনা :

ওয়ালিদ ইবনে উতবা এই আদেশ পেয়ে প্রথমে ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজ প্রাসাদে তলপ করলেন এরপর বায়াত গ্রহণ করতে বললে তিনি বললেন, এখন এটা বায়াতের সময় না। আমার মত ব্যক্তি এভাবে গোপনে বায়াত করতে পারে না।কাল মিম্বরে বসে আপনি আমার থেকে বায়াত নিয়েন।এর ঠিক কিছুক্ষণ পরে এলেন হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু। যেহেতু ওয়ালিদ ইবনে উতবা একটু নরম প্রকৃতির ছিলেন তাই দুজনকেই বায়াত গ্রহণের জোর করলেন না। উভয়কেই যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে তাদের পিছনে লোক নিযুক্ত করে দিলেন।

ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রের অবস্থা দেখে রাতের শেষ প্রহরে ফুর এর পথ ধরে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

দিন সকালে ওয়ালিদ যখন এই সংবাদ জানতে পারল তখন সে ৩০ বা ৮০ জন অশ্বারোহী সৈন্যকে পাঠালো। কিন্তু তাদের ধরা গেল না।

এর একদিন থেকে দুদিন পর হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিবার পরিজনসহ মদিনা ছেড়ে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। তাদের মক্কা যাওয়ার কারণ ছিল, মদিনা শামের কাছাকাছি ছিল। মক্কা ছিল দ্বিগণ দূরত্বে। তাছাড়া মক্কার পাহাড় পর্বতে বেষ্টিত ছিল। যেখানে প্রশাসনের পক্ষে তাদের গ্রেফতার করা ছিল ভীষণ কঠিন ব্যাপার। উপরন্ত

কাবার সম্মানের দিকটা সামনে রেখে এটা সহজেই ভাবা যাচ্ছিল যে ওখানে প্রশাসন আপত্তিকর কিছু করে জনগণের ঘৃণার উদ্রেক করবে না।

মদিনায় যাওয়ার পূর্বে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু এর সাক্ষাৎ :

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় রওনা হওয়ার পূর্বে বিদায় সাক্ষাতের জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ এর কাছেও গিয়েছিলেন। তিনি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা শুনে বললেন, মদিনা ছেড়ে যেওনা। হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু কিন্তু হুসাইনকিছু বললেন না। এরপরে কথার এক ফাঁকে হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে সেই চিঠিও দেখালেন যাতে ইরাকবাসীদের ইচ্ছা ও আগ্রহের কথা লেখা ছিল। ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই চিঠি দেখে বললেন তুমি ওইসব লোকের কাছে যেও না। এভাবে যখন বিদায়ের সময় হয়ে এলো তখন হযরত ইবনে উমর রাঃ এর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। আর বললেন হে শহীদ আমি তোমাকে আল্লাহতালার হাতে সর্পদ করলাম। মক্কা যাওয়ার পথে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মতি রঃ এর সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছেন?

উত্তরে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন আপাতত মক্কায় যাচ্ছি। এরপর কি করা যায় সেটা ভেবে দেখতে হবে। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, হুসাইন রদিআল্লাহু আনহু কে কুফাবাসীরা উদ্বুদ্ধ করা পরেও তিনি সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। কারণ তিনি কুফায় যেতে চাইলে মদিনা থেকে সেখানকার দূরত্ব ছিল তুলনামূলক কম।

অথচ প্রসিদ্ধ বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি রবিবার ২৭ বা ২৮ রজব মদিনা থেকে বের হয়ে অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সাথে সফর করে শুক্রবার তিন বা চার সাবান মক্কায় পৌঁছান। এখানে তিনি চার মাস পাঁচ দিন অবস্থান করেন।

মদিনার ধরপাকর, ওয়ালিদ ইবনে উতবার অপসারণ ও উমর ইবনে সাইদের নিয়োগ:

হযরত হোসাইন রাঃ ও হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মদিনা থেকে চলে আসলেন তখন গভর্নর ওয়ালিদ বিন উতবা আব্দুল্লাহ বিন মুটি রদিয়াল্লাহু আনহু ও মুসাব ইবনে আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে গ্রেফতার করে জেল বন্দি করেন। মদিনার অধিবাসীরা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে অনুরোধ করলে তিনি গভর্নরকে জুলুম ও অন্যায় পথ থেকে সরে আসতে এবং বন্দিদেরকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। ওয়ালীর নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বললো আমিরুল মুমিনের নির্দেশ এমনটাই ছিল।

মদিনার অধিবাসীরা এই অবস্থা দেখে নিজেরাই জেলখানায় হামলা করে বসলো। এতে মুক্তি পেয়ে গেলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুতি রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি তখনই পালিয়ে মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু য়ের কাছে গেলেন।

হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ইবনে যুবাইর রাঃ এর বায়াত গ্রহণ করতে না পেরে ইয়াজিদের পেরেশানি বেড়ে গেল। ব্যর্থতা গভর্নর ওয়ালীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে মদিনার প্রশাসকের পর থেকে অপসারণ করে তার পরিবর্তে নিয়োগ করলো আমর ইবনে সাইদ কে, কঠোরতায় যে ছিল সবার শীর্ষে। রমজান মাসে দায়িত্ব পেয়ে ই সে শপথ করে মক্কা আক্রমণ করবে। তার জন্য এই কাজ সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া শাওয়াল মাস শুরু হয়ে যাবে অবস্থা হাজীদের কাফেলা মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জিলহজ মাস শেষ এবং হাজীদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক যাওয়ার ইচ্ছা কেন করলেন?

মক্কায় যাওয়ার পর থেকে হজ চলাকালীন পূর্ণ সময়টাই হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইবনে যুবাইর রদিআল্লাহু আনহু উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে খুব ভাবলেন। পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য কোন

জায়গা দরকার। স্থান নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হল। ইবনে জুবাইয়ের রাঃ মক্কাকে আন্দোলনের জন্য নিরাপদ ও উপযুক্ত মনে করলেন। কারণ এখানে বড় বড় সাহাবী উপস্থিত। শুভ্র তাওহিদি চেতনা লালনকারী অনেক। কুরাইশ ছাড়াও দেখাশোনা করার লোক আছে। তাই তিনি চাইলেন হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু যেন তাই ভাবেন। কিন্তু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকবাসীর পক্ষ থেকে বারবার চিঠি প্রেরণ এবং তাতে শতভাগ সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবলেন।কারণ প্রথমত তার কাছে আন্দোলনে জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এদিকে হিজাজের অধিবাসীদের চেয়ে ইরাকের লোকজনের শক্তি থেকে সামর্থ্য ছিল অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, তিনি নিজের চেয়েও অনেক বেশি ভালবাসতেন মক্কার পবিত্র ভূমিকে। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারছিলেন হজ্জের মৌসুম শেষে তিনি যদি মক্কায় অবস্থান করেন ইয়াজিদ কোন কঠিন সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিবে। সেজন্যই মক্কায় অবস্থান কালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি বলেছিলেন যদি আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা হয় তাহলে তাতে আমার কোন আফসোস নেই। কিন্তু আমি এটা কোনভাবে সহ্য করব না যে আমার কারনে মক্কার এই পবিত্র ভূমির সামান্য সম্মান ক্ষুণ হবে।
তিনি ইরাকিদের নানান রূপ ও রং ধারণের পারে একেবারেই অনবগত ছিলেন না। ইরাকবাসীদের উপর তার অন্ধবিশ্বাস ছিল না তিনি ইরাক যাওয়ার ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়া করেননি।বরং ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন করেছিলেন।

বড়দের অধিকাংশ কেন ইয়াজিদের হাতে বাইয়াতে সন্তুষ্ট ছিলেন?

ইতিমধ্যে ইয়াজীদ তার শাসন ক্ষমতা
আরো পক্ত করে বসলো স্থানে স্থানে জারি করে দিল বায়াত গ্রহণের আদেশ। ধীরে ধীরে প্রায় সব গভর্নর বায়াত গ্রহণ করল।
এখন প্রশ্ন যদি ইয়াজিদের খেলাফত খেলাফায়ে রাশেদীনের আদলে না হয়ে থাকে তাহলে কেন প্রবীণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তার হাতে বায়াত গ্রহণ করলো?

আসলে বাস্তব বিষয়টা হলো পূর্ব থেকেই মুয়াবিয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতাদর্শ ও চিন্তাধারার সাথে অনেকেই একমত ছিল। তাই সে হিসেবে তার হাতে বায়াত হয়েছিল। আর কেউ কেউ শরীয়তের অন্যান্য দিক বিবেচনা করে বায়াত হওয়াকেই উত্তম মনে করেছিলেন।এতে বিচ্ছিন্নতা ও বৈপরীত্য দূর হয়ে ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকবে,যে আদেশ কুরআন ও হাদিসের বারবার এসেছে দিনের সেই গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও আদর্শ পালনের জন্য অনেকে মন্দ ও নিম্ন স্তরের কাজ করাকেই ভালো মনে করেছেন। তাই তারা বায়াত হয়েছিলেন।

এক বর্ণনায় আছে, ইয়াজিদ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় একজন সাহাবীর কাছে গেলে তিনি বলেছিলেন, সবাই বলছে, রাজিব উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে কোন ভাল লোক নয়। জ্ঞান বুদ্ধিমতা ও মর্যাদায় সবার শীর্ষে নয়। আমিও এমনই বলি। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও মতানৈক্য সৃষ্টি করা থেকে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা কে প্রাধান্য দিচ্ছি।

তা ছাড়া বড়ো দের বায়াত গ্রহণের আরো একটি কারণ এটাও ছিল যে, খেলাফত গ্রহণের সময় কালে ইয়াজিদের ব্যাপারে তেমন বড় কোন সমস্যা ছিল না। যেমনটা ছিল পরবর্তীতে।

হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত ইবনে ওমর ইয়াজিদের বায়াতের ব্যাপারে কি বলেছিলেন?

ইয়াজিদের প্রতিনিধি যখন বায়াত গ্রহণের জন্য ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে গেলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম মুয়াবিয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পূর্ববর্তী খলিফাদের মত ছিলেন না। এবং তার পরেও তার মত অন্য কোন খলিফা আসবে না। নিঃসন্দেহে ইয়াজীদ তার বংশধর।সুতরাং সবাই এখন আরাম করে যার যার মত বসে থাকো এবং ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করে তার আনুগত্য স্বীকার করো। এরপর তিনি নিজেও বায়াত হলেন।

আর হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অবস্থান ছিল যদি সকলেই বায়াত গ্রহণ করে তাহলে আমিও বায়াত গ্রহণ করব। এজন্য যখন তিনি দেখলেন সবাই বায়াত গ্রহণ হয়ে গেছে তিনিও হয়ে গেলেন। কারণ তাতে উম্মতের মধ্যে

রক্তপাত ও অনিষ্টতার আশঙ্কা কম ছিল। একথা প্রকাশ্য যে এই বায়াত খুশি ও আগ্রহের ছিল না। এজন্যই তিনি বায়াত গ্রহণের সময় বলেছিলেন, এতে কল্যান থাকে আমি সন্তুষ্ট আর যদি অকল্যাণ ও মুসিবত থাকে তাতে ধৈর্য ধারণ করব।

ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কি কোন নম্রতা বা ছাড় প্রকাশ পাচ্ছিল?

এর সংক্ষেপ উত্তর হল না।সে শাসন ক্ষমতায় এসেই জোরপূর্বক অনেক কিছু করে।
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নামে ইয়াজিদের চিঠি :
হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন ও মক্কায় ছিলেন। এরই মধ্যে ইয়াজিদ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন।যার ভাষ্য থেকে একথা স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল যে, ইয়াজিদ হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে ও বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে তার স্পষ্ট সতর্ক বাণী ফুটে উঠেছে।চিঠিতে লিখেছিল, পূর্বাঞ্চলের লোকজন এসে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে খিলাফতের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আর আপনার তো তাদের বৃত্তান্ত জানা আছে। তাদের পূর্ব আচরনের অভিজ্ঞতা আছে। এখনো হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি আমাদের দৃঢ় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেন কোন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আপনি আপনার গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ও সর্ব মান্য, তাই আপনি তাকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির থেকে বিরত রাখুন।
এই চিঠির জবাবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখেছিলেন, আমি আশা করি হোসাইনের গমন তোমার ক্ষতির কোন উদ্দেশ্য হবে না। যা দ্বারা সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় এবং উত্তেজনা প্রশমিত হয় এমন প্রতিটি বিষয়ে আমি তাকে উপদেশ না দিয়ে ছাড়বো না।
মোটকথা দামেশকে এক অস্থির ও সন্ত্রস্ত ভাব বিরাজ করছিল। আইন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে কুফা বাসীর সখ্য দেখে ইয়াজিদ ভীত হয়ে পড়েছিল। কোথাও আবার বড় রকমের বিদ্রোহ না করে বসে। অপরদিকে হুসাইন রাঃ এই বিশ্বাস ছিল যে, ইয়াজিদ ও তার নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের আটটি না ভেবে বিদ্রোহ মনে করে হত্যা করে ফেলবে। এজন্য তখন ইয়াজিদের সাথে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করাকে উপযুক্ত মনে করেননি। বরং ইরাক দিয়ে নিজেদের সাথীদের নিয়ে এই অবস্থার অবসান করাটাই ভালো মনে করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নামে ইয়াজিদের চিঠি:

হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু তখনো মক্কায় ছিলেন। এরই মধ্যে ইয়াজিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করে, যার ভাষ্য থেকে একথা ফুটে উঠেছিল যে, ইয়াজিদ হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর সকল অবস্থা সমানভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে তার স্পষ্ট সতর্কবাণী ঝলকে উঠেছে। চিঠিতে ইয়াজিদ লিখেছিল, পূর্বাঞ্চলের লোকজন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আর আপনার তো তাদের বৃত্তান্ত জানা আছে এবং তাদের পূর্ব আচরণের অভিজ্ঞতা আছে। এখন হুসাইন রাদিআল্লাহু যদি এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তো তিনি আমাদের দৃঢ় আত্নীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে চলেছেন। আপনি আপনার গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ও সর্বমান্য তাই আপনি তাকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির চেষ্টা থেকে বিরত রাখুন। ইয়াজিদের এই চিঠির জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু লিখেছিলেন, আমি আশা করি হুসাইনের গমন তোমার ক্ষতিকর কোন উদ্দেশ্যে হবে না। যা দ্বারা সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় এবং উত্তেজনা প্রশমিত হয় এমন প্রতিটি বিষয়ে আমি তাকে উপদেশ না দিয়ে ছাড়ব না।

মোটকথা, দামেশকে এক অস্থির ও সন্ত্রস্ত ভাব বিরাজ করছিল এবং হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে কুফাবাসীর সখ্য দেখে ইয়াজিদ ভীত হয়ে পরেছিল। কোথাও আবার বড় রকমের বিদ্রোহ করে না বসে! অপরদিকে হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর এই বিশ্বাস ছিল যে, ইয়াজিদ তার ও তার নেতৃবর্গ এই আন্দোলনের আগ-পিছ কিছু না ভেবে বিদ্রোহী মনে করে হত্যা করে ফেলবে। এজন্য তখন ইয়াজিদের সাথে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করাটাকে তিনি উপযুক্ত মনে করেননি। বরং ইরাক নিয়ে নিজের সাথিদের নিয়ে এই অবস্থার অবসান করাটাই ভালো মনে করলেন।

ইরাকের চিঠি:

কুফা বাসীদের থেকে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে বারবার চিঠি প্রেরণ ও লাগাতার প্রতিনিধি দলের আগমন এটাই স্পষ্ট করছিল যে, পুরো ইরাক এখন ইয়াজিদের আয়ত্তের বাইরে। শুধু কুফাতেই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহযোগিতার জন্য এক লাখ সশস্ত্র সৈন্য তৈরি রয়েছে। এবং তারা গভর্নর নোমান বিন বাশির রদীয়াল্লাহ আনহু এর পেছনে জুম্মার নামাজ আদায় করাও করে দিয়েছে। তিনি ছাড়া কারো ওপর তেমন ভরসাও করতে পারছে না।

পরিস্থিতি এতটাই অশান্ত ছিল যে, যদি দ্রুত ইরাক সকল না করেন তাহলে সেখানকার সাহসী এবং ক্ষীপ্রো

অভিরুচির লোকেরা সেখানে যেকোনো সময় বিদ্রোহ করে বসতে পারে।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিবেচনা করে বুঝতে পারছিলেন, এই স্বল্পবুদ্ধির মানুষ গুলোকে নিজেদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে মায়া ও মহব্বত দিয়ে তাদেরকে তরবিয়ত করার চেষ্টা করাই বেশি কল্যাণকর।দ্বিতীয় কেউ এমনও ছিলেন না, তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে সঠিক দিকনির্দেশনা দেবেন। এর অবস্থার উপরেই ছেড়ে দেয়া হলে অযথাই খুন খারাপি ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটা অসম্ভব কিছু ছিল না। এজন্যই হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শত সমস্যা ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ইরাকে যাওয়া জরুরী মনে করেন। তিনি ভেবেছিলেন সেখানের লোকেরা তাকে আনন্দ ও সাগ্রহে গ্রহণ করবে। হিজাজের অধিবাসীরাও তাকে সহযোগিতা করবে। বিশাল জনসংখ্যা দেখে শামের অধীবাসীরা এমনিতেই নতি স্বীকার করবে। আর যদি না করে ও খুব বেশি রক্তপাতের প্রয়োজন হবে না।ইরাক এবং হিজরাদের সম্মিলিত শক্তির সামনে অল্পতেই হার মানতে বাধ্য হবে।ফলে খুব সহজে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে।

৬০ হিজরির কুফা :

৬০হিজরীতে যখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় যাওয়ার চিন্তা করছিল তখনও শিয়ারা তাদের পূর্ব অবস্থানে ছিল। রাফিদেরকে চেনা যায় তেমন তাদের পরিচয় বা

কোনটাই ছিল না। হযরত হোসাইন রাঃ যাদের আহবানে যেতে চাচ্ছিলেন তাদের অধিকাংশ সহী আকিদায় পোষণ করত ও তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বুজুর্গ ও নামকরা ব্যক্তি। সাধারণ জনগণ থেকে তারা চিন্তায় শুধু এতটুকুই ব্যতিক্রম ছিলেন যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর প্রাধান্য দিতেন। অযথাই কোন রক্তপাতের পক্ষে তারা ছিলেন না।

কুচক্রি মহলের চক্রান্ত কি ছিল?

কুচক্রি মহল এটা জানতো যে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় আসবেন জনগণের হিতাকাঙ্খী হয়ে। অপরদিকে এটাও তাদের জানা ছিল যে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদ ও তার প্রশাসক মহলে একজন বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হিসেবে পরিচিত। তাদের কাছে এটাও দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল যে কুফার অধিবাসীগণ যদিও বনু হাশিমের ব্যাপারে ভয়াবহ মাত্রায় দুর্বল।কিন্তু বিপদের সময় পিছ পা হতে দ্বিধা করে না। তাই তারা ঠিক করল প্রথমে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোনভাবে কুফায় রওনা করাতে হবে। দ্বিতীয়ত এসে পড়ার আগেই কুফাই কিছু আপত্তিকর ঘটনা ঘটাতে হবে। যাতে ইয়াজিদ ও তার প্রশাসকবর্গের ধারণা হয় হুসাইন রদিআল্লাহু আনহুর জন্যই এসব হচ্ছে। ফলে তারা এসবের সত্যতা যাচাই না করেই অবশ্যই দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নিবে। ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে শহীদ করে দেবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন কঠিন পদক্ষেপ নেয়া হয় তাহলে কুফার অধিবাসীরা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসবে এবং একেবারে চুপসে যাবে।

তবে এ কথা সত্য যে আমাদের কাছে এই কুচক্রী মহলের নাম বা ধারাবাহিক কর্ম সম্পাদনের প্রমাণ নেই। কবে পরবর্তী ধারাবাহিক আপত্তিকর ঘটনা গুলো বিচ্ছিন্ন নয়। পর্দার পেছনে এমন মানুষ ছিল যারা সমাজ ও সমাজের মানুষকে ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছিল। ও নিঃসন্দেহে তারা কুফাবাসীই ছিল। এ কারণে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবী কেরামও কারবালার দুঃখজনক ঘটনার জন্য কুফা বাসীকেই অভিযুক্ত করেছেন। যদিও কু চক্রী মহলের নাম নিশ্চিত ভাবে লিখতে পারছি না। তবে ধারণা করা যায় এটা তাদের মধ্যেই কারো কাজ। অবশ্য

চিঠি প্রেরক দের অনেকেই নেক স্বভাবের ছিলেন এবং হযরত আলী রাঃ এর প্রতিও খুব দুর্বল ছিলেন তারা তো অবশ্যই নয়। কিন্তু কুচক্রী মহল তাদের সাথে ছিল।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি ইবনে যুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহুর পরামর্শ :

হিজাজাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কুফার পূর্বাপর ইতিহাস সম্পর্কে ভালো করে অবগত ছিলেন।হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন হিজাজ ছেড়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন সকলেই তাকে কোথাও না গিয়ে হিজাজে থাকার পরামর্শ দিলেন।ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন আপনি কি তাদের কাছে যাবেন যারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছে, যারা আপনার ভাইকে হত্যা করেছে? হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন যদি আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা হয় তাহলে তাতে আমার কোন আফসোস থাকবে না। কিন্তু আমি এটা কোনভাবেই সহ্য করতে পারবো না যে আমার কারনে হিজাজের এই পবিত্র পূরণের সামান্য সম্মান ক্ষুন্ন হবে।

মুসলিম ইবনে আকিলের কুফায় রওনা :

হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু যখন কুফা থেকে বারবার চিঠি পেয়ে ও প্রতিনিধি আসতে দুখে ভাবলেন কুফায় গিয়ে কিছু করা সম্ভব। তাই তিনি যাওয়ার পূর্বে তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিল ইবনে আবু তালিবকে প্রকৃত অবস্থা যাচাই ও ইরাকবাসীর ঐক্যবদ্ধতার পর্যবেক্ষণয়ের জন্য ইরাকে পাঠান। যেন সে নিজ চোখে তাদের আসল অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ রাখেন।

মুসলিম ইবনে আকিলের সাথে নুমান ইবনে বাশিরের সাক্ষাৎ :

মুসলিম ইবনে আকিল যখন কুফায় পৌঁছলেন তখন তিনি হানি বীন উড়ওয়া নামক এক খাঁটি মুসলিমের ঘরে অবস্থান করেছিলেন। কুফা বাসি তার আগমনের সংবাদ শুনতে পেল। তখন তার কাছে এসে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাষণ কর্তৃত্বের অনুকূলে বায়াত গ্রহণ করল। তৎকালীন সময়ে কুফার গভর্নর ছিলেন নোমান ইবনে বাঁশির রাদিল্লাহু আনহু।তিনি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। মুসলিম ইবনে আকিলের আগমন ও তার উদ্দেশ্য জানা সত্ত্বেও তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন ও এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না এরপর কোন কোন উত্তপ্ত কর্মকর্তা যখন তাকে এসব বিষয়ে অবগত করল এবং তাকে দুর্বল হিসেবে দেখা দিল তখন তিনি বললেন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ভেতর থেকে দুর্বল গণ্য হওয়া আমার কাছে তার নাফরমানি থেকে শক্তিধর ও পরক্রমশালী হওয়ার চেয়ে প্রিয়। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বললেন মিথ্যা অপবাদ বা কুধারণার কারণে আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করব না।কিন্তু আল্লাহ সশপথ যদি তোমরা আমিরকে বর্জন করো ও প্রত্যাহার করো তাহলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই করে যাব যতক্ষণ আমার হাতে আমার তরবারি থাকবে।তার কাছে হুসাইন রদিআল্লাহু আনহু এর তৎপরাওতা ও আন্দোলনকে ফেতনা ও বিদ্রোহ মনে হচ্ছিল না।তাছাড়া একজন গভর্নর হিসেবে তার কাছে কিছুই গোপন ছিল না।যদি তারা প্রকৃতপক্ষেই প্রস্তুতি নিতেন তাহলে সে কথাও তিনি জানতে পারতেন। এবং এর বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতেন।

ইবনে আকিলের সন্তোষজনক পত্র প্রেরণ এবং হুসাইন রাদিআল্লাহুর সফরের দৃঢ় সংকল্প :

মুসলিম বিন আকিল কুফায় পরিস্থিতি সন্তোষজনক দেখে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পত্র প্রেরণ করলেন। তাতে তিনি লিখলেন **১২** হাজার মানুষ বায়াত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি চলে আসুন। এই চিঠি **১১** জিলকদ ৬০ হিজরীতে প্রেরণ করা হয়েছিল।

কুফায় অবস্থার পরিবর্তন এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের নিয়োগ:

মুসলিম ইবনে আকিলের চিঠি পৌঁছেতে প্রায় তিন থেকে চার সপ্তাহ লেগে যায়। এর মধ্যে কুফায় অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়।যা হুসাইন (রা:) জানতে পারেননি। কেমন কুফায় কঠোর প্রিয় কিছু সেনাপতি মুসলিম ইবনে আকিলের প্রতি নম্রতা প্রদর্শনের কারণে গভর্নর নোমান ইবনে বাশির রাদিআল্লাহু আনহুর প্রতি অসন্তুষ্ট হল। তাকে বকাঝকা করেও যখন কাজ হলো না তখন ইয়াজিদকে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে সংবাদ পাঠাল। ইয়াজীব সংবাদ পেয়ে দুত পাঠালো ও নোমান বিন(রা:)আনহু কে কুফার থেকে অপসারণ করলো। এবং বসরার পাশাপাশি কুফাকেও উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের শাসন কর্তৃত্বের অধীন করে দিল। সেই সাথে নির্দেশ দিল কুফায় গিয়ে মুসলিম বিন আকিলকে হত্যা করতে তাকে আয়ত্তে পেলে হত্যা অথবা নির্বাসিত করতে।

এভাবে ইরাকের সকল কার্যক্রম এমন এক ব্যক্তির অধীনে এসে গেল যে, ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতর কোন ঘটনার জন্ম দিতে সামান্য কোনটা বোধ করত না। ওবায়দুল্লাহ বিন জিহাদ আদেশ পেয়ে বসরা থেকে কুফায় গেল। আমির হামিদ বিন উরুয়াকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। ফলে ইবনে জিয়াদ হানির মুখ মন্ডলে বর্শঘাত করে করে তার ভ্রূর উপর ক্ষতের সৃষ্টি করল। নাক ভেঙ্গে দিল। তারপর হানিকে দুর্গে বন্দী করে রাখল।

মুসলিম বিন আকিলের হত্যা :

এই খান টাই এসে মুসলিম বিন আকিলের একটুও পদস্কখলন ঘটেছে, যেই কারণে পূর্ণ ঘটনার মোড় পাল্টে গেল। তিনি মেজবান হানি বীন উরুয়াকে মুক্ত করার জন্য ৪০০০ এর সৈন্য বাহিনী নিয়ে ময়দানে চলে এলেন যখন তিনি তাদেরকে নিয়ে ইবনে জিয়াদের প্রাসাদের কাছাকাছি গেলেন তখন ইবনে জিয়াদ ভয়ে প্রাসাদের দ্রুত প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল। এরপর কুফাবাসীরা তাদের পুরাতন অভ্যাসটাই প্রকাশ করে দিল। তিনি যখন সামনে বাড়ছিলেন তাকে অসহায় অবস্থায় রেখে ৫০ জন বাদে সবাই পালিয়ে গেল। এরাও ধীরে ধীরে চালাকি করে শটকে পরল। তিনি একাকী হয়ে পড়লেন। তাকে গ্রেফতার করার জন্য ইবনে জিয়াদ সিপাহী পাঠালো। তিনি একাকী লড়লেন এবং আহত হয়ে সেখান থেকে কেটে পড়লেন। রাতের অন্ধকারে বনু হাশেমের এই সন্তান ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরতে থাকলেন তার সাথে না থাকল পদ দেখানোর বা অন্তরঙ্গতা দান করা বা সগৃহে আশ্রয় দান করার মতো কেউ। অবশেষে তাওয়া নামের এক নারী তাকে পানি পান করালেন এবং উনি মুসলিম বিন আকিল জানতে পেরে তার ঘরে আশ্রয় দিলেন।কিন্তু তাওয়ার ছেলে আব্দুর রহমান এই সংবাদ জানিয়ে দিল। এরপর মুসলিম ইবনে আকিলকে সেখান থেকে গ্রেফতার করল এবং ইবনে জিয়াদ তাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করে প্রাসাদের ছাদ থেকে নিচে নিক্ষেপ করল। সাথে হানি ইবনে উরওয়াকেও হত্যা করল।

কুফা যাওয়া থেকে সাহাবীদের বারণ:

হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় যাওয়ার পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, সপরিবারে জিলহজ মাসের প্রথম দিকে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু তার কাছে কুফার কোন সংবাদই ছিল না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিল্লাহু আনহু হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু সহ অনেকেই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে মক্কা ছেড়ে যেতে বারণ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আস রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন হুসাইন তার ভাগ্য বিধানকে ত্বরান্বিত করেছেন। আল্লাহর শপথ আমি যদি তার নাগাল পেতাম তাহলে আমাকে পরাজিত না করা পর্যন্ত তাকে বের হতে দিতাম না। শত নিষেধ সত্বেও হুসাইন রদিআল্লাহু আল্লাহু থামলেন না। তার ইজতেহাদ ও বিবেচনা অনুযায়ী এই পথ অবলম্বন করাই ভালো মনে করেছিলেন। আসলে তার হৃদয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর শতভাগ সন্তুষ্টি এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা ছাড়া কিছু ছিল না।

চিঠি সাথে নিয়েছিলেন কেন?

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় যাওয়ার সময় সেই সব চিঠি ও সাথে নিলেন, যেগুলো তিনি কুফা বাসীদের থেকে পেয়েছিলেন। কারণ ছিল যদি ঘটনা ক্রমে কুফা বাসিরা তাদের ওয়াদার কথা ভুলে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে অন্তত এই চিঠিগুলো দিয়ে অন্তত তাদেরকে ওয়াদা ও অঙ্গীকারদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যাবে। প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে তিনি আট জিলহজ মক্কা থেকে রওনা হয়েছিলেন কিন্তু প্রাধান্য মত হল তিনি এর পূর্বেই রওনা হয়েছিলেন।

ইয়াজিদকে হুসাইন (রা:) এর রওনা হওয়ার সংবাদ অবগত করা এবং ইবনে জিয়াদকে মারওয়ানের চিঠি প্রেরণ :

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু রওনা হওয়ার কথা যখন হিজাজের গভর্নর
ওমর ইবনে সাঈদ জানতে পারলো তখন সে এই সংবাদ আবার দামেশক এবং কুফায় পাঠিয়ে দিল। সে আব্দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে লিখলো হুসাইন তোমাদের দিকে যাচ্ছে। এই সংবাদ টাই মারওয়ান ইবনে হাকাম আবার ইবনে জিয়াদকেও দিয়েছিল। সেই সাথে খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখার পরামর্শ দিয়েছিল। তবে এটা সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত নয় বরং নিছক পরামর্শ। মারোয়ান লিখেছিল,পর কথা হল, হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু তোমার অভিমুখে

রওনা হয়ে গেছেন মনে রাখবে তিনি হলেন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র হোসাইন আর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হলেন আল্লাহর রাসূলের কন্যা।

আল্লাহর শপথ আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা লাভকারী কেউই আমাদের কাছে হুসাইনের চেয়ে অধিক প্রিয় না কাজে সতর্ক থেকো নিজের বিরুদ্ধে এমন কিছু উস্কে দিও না যাকে কোন কিছুই রোধ করতে পারবে না সর্বসাধারণ যা ভুলবে না এবং শেষকাল পর্যন্ত তারা যার সমালোচনা ছাড়বে না।মারওয়ানের এই চিঠি থেকে বোঝা যায় বনু উমায়ার লোকেরা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মান ও মহব্বত করত কিন্তু আফসোস ইবনে জিয়াদ তার কোন কথাতেই কানে দিলো না।

ইবনে জিয়াদের কাছে ইয়াজিদের চিঠি :

এই সময় ইয়াজিদ ইবনে জিহাদকে একটি পত্র পাঠালো, লেখা ছিল আমি জানতে পেরেছি যে,হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার দিকে রওনা হয়েছেন। তার এই পদক্ষেপ দ্বারা তোমার শাসনের স্থান ও কাল বিশেষভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে এবং প্রশাসকদের মাঝে তুমি বিশেষভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছ। আর এ ধরনের পরীক্ষার ফল দাঁড়ায় মানুষ স্বাধীনতা ও সম্মান লাভ করে এবং কিংবা ক্রীতদাসের ন্যায় দাসত্ব ও অপমান বরণ করে।

সেই সাথে এই হুকুম দিয়েছে যে গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র বাহিনীকে পর্যবেক্ষণের কাজে লাগিয়ে দাও আর যার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা হয় তাকে আটকে রাখো আর অভিযুক্তকে শক্তভাবে পাকড়াও কর। তবে তোমার বিরুদ্ধে লড়াইকারী ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না। আর ইতিবাচক যা ঘটে সে ব্যাপারে আমাকে লিখে জানাও।

ইয়াজিদের চিঠির উপর কিছু বিশ্লেষণ ও বিবেচনা :

ইয়াজিদের চিঠি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইবনে জিয়াদকে ইয়াজীদ প্রথমে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফেলায় আক্রমণ করতে নিষেধ করেছিল এবং যুদ্ধের শর্তের সাথে জুড়ে দিয়েছে।হয়তো ইয়াজিদ এতোটুকুই যথেষ্ট মনে করেছিল। কিন্তু

পরিস্থিতি বলছে এই দিক নির্দেশনা উপযুক্ত ছিল না। কারণ মুসলিম ইবনে আকিলকে হত্যার পর ইবনে জিয়াদের দুঃসাহস অনেক বেড়ে গিয়েছিল।এখন সে যদি সামান্য ইঙ্গিত পাই হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করার তাহলে জঘন্য কাজটা করতে তার এক মুহূর্ত ভাববার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ইয়াজিদ যদি চিঠির ভাষা কিছুটা পরিবর্তন করে লিখতে যে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সসম্মানে দামেসকে পাঠিয়ে দাও তাহলে হয়তো এমন ঘটনা ঘটতো না।নিশ্চয়ই ইয়াজিদের এই ভুলের কারণেজনগন ঘর বিপাকে পরিণত হয়েছে।

হুসাইন(রা:) কে কুফার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখার জন্য ইবনে জিয়াদের অপচেষ্টা :

মুসলিম বিন আকিল কে হত্যার পর ইবনে জিয়াদের একমাত্র চেষ্টা ছিল যে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব সংবাদ যেন কোন ভাবে জানতে না পারে কোথাও থেকে বসরা এবং সামের এলাকাগুলোকে পুরোপুরি পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে রাখল যাতে কেউ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত খবর পৌঁছাতে না পারে।মুসলিম বিন আকিলকে হত্যা করা হয়েছিল আটই জিলহজ আর হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই দিনই কিংবা তার দু-তিনদিন পর মক্কা ছেড়ে কুকার পথ ধরেছেন এমন অবস্থার কারণে তিনি এটাও জানতে পারেননি যে কুফায় এখন নরম মনের সেই গভর্নর নোমান ইবনে বাসের রাঃ আর নেই বরং তার স্থানে সমাসীন হয়েছে পাথর দিল ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ।পথ অবরুদ্ধ থাকায় কোন সংবাদ না পেয়ে হুসাইন
রাদিআল্লাহু আনহু অগ্রসর হতে থাকলেন।

হুসাইন (রা :) য়ের প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা এবং মুসলিম বিন আকিলের ভাইয়ের সামনে অগ্রসরের তাগিদ :

ইরাকের খুব কাছাকাছি যাওয়ার পর হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু খবর পেলেন যে মুসলিম ইবনে আকিলকে হত্যা করা হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন যে এখন তো তাহলে শাসকদের পক্ষ থেকে আমাদের ব্যাপারেও কঠিন পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং জনসাধারণ থেকে ওয়াদা ভঙ্গ ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না। সর্বশেষ মুসলিম বিন আকিল আর হানি বিন উড়ওয়ার মত ইবনে জিহাদ আমাদেরকেও হত্যা করবে। এজন্য তিনি হিজাজে ফিরে যাওয়াই উত্তম মনে করলেন। কিন্তু ভাগ্যে যা লেখা ছিল তা তো ঘটবে। তাই যখন তিনি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন।তখন মুসলিম বিন আকিলের ভাই বলল আল্লাহর শপথ আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের রক্তের প্রতিশোধ না নেব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে যাব না যদি সকলেই নিহত হয়ে যাই তবু এর বদলা নিয়ে ছাড়বো। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমাদের ছাড়া আর বেঁচে থেকেই বা কি লাভ!

টগবগে সেই যুবক এটাও বলেছিল যে আপনি ফিরে যেতে চাচ্ছেন অথচ তারা আমার ভাইকে হত্যা করেছে। এসব বিভিন্ন কথা শুনে হুসাইন রাঃ সাহস ফিরে পেলেন এবং অগ্রসর হতে থাকলেন। যেখানটায় ইবনে জিহাদ পাহারাদার লাগিয়েছিল একেবারে সেখানে পৌছলেন এরপর এখানেই তাদের সাথে ইবনে জিয়াদের সিপাহী হুররা বিন ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ হয়।

হুররা বিন ইয়াজিদের পরামর্শ, হুসাইন (রা :) এর দামেষ্ক যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং তার কারণ :

হুররা বিন ইয়াজিদ একজন ভদ্র মানুষ ছিলেন। তিনি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কল্যাণ কামনা করছিলেন। তাই প্রথমে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কোথা যাচ্ছেন? তখন তিনি খুব কঠোরভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন আপনি ফিরে যান ওখানে কোন কল্যাণের আশা নেই। এই পরিস্থিতিতে হুসাইন (রা:) দামেশকে

ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এই সিদ্ধান্ত এতই বিরোধ ছিল যে বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ তিনি দামেস্কের পথ ধরলেন।

হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কার্যক্রম ভিন্ন হওয়ার কারণ হলো তিনি অন্তদৃষ্টি দ্বারা এটা বুঝতে পারছিলেন যে ইয়াজিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সুতরাং এখন এটাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা মানে বিদ্রোহ। তিনি চাচ্ছিলেন দামেসক গিয়ে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।হোসেন আনহু এর কুফার যাওয়ার উদ্দেশ্যও ক্ষমতা অর্জন ছিল না। বরং ইয়াজিদের দুর্বল দিকগুলোই সংশোধন করা ছিল তার মূল লক্ষ্য। কুফা বাসীদেরকে একত্র করে সম্ভবত তিনি সেই কাজটাই সহজ করতে চাচ্ছিলেন।কিন্তু পরিস্থিতি যেহেতু সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। তাই তিনি সরাসরি ইয়াজিদের সাথে কথা বলাকেই জরুরি মনে করলেন। কারণ এ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না।

এ ব্যাপারটা স্পষ্ট ছিল যে দামেসক এবং কুফার শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত সবাই হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহী হিসেবেই দেখছিল।তাই ইয়াজিদকে বোঝানো যতটা সহজ ছিল ইবনে জিহাদকে ততটা সহজে বোঝানো সম্ভব ছিল না। তিনি দামেস্কের পথে সম্ভবত ৪৫ মাইল সফর করে অবশেষে কারবালায় পৌঁছলেন যা কুফা থেকে দামেসক যাওয়ার পথে অবস্থিত ছিল।ওখান থেকে ফোরাত নদীর তীরবর্তী অঞ্চল কাছেই ছিল যাকে আত্তাফ নামকরণ করা হয়েছে ।

ইবনে জিয়াদ আসলে কি চাচ্ছিল এবং কেন?

ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ যদি একটু রাজি থাকতো হুসাইন রাদিআল্লাহ আনহু কাফেলাকে সামের দিকে নিয়ে যেতে পারতেন।কিন্তু আফসোস সে সামান্য দয়া ও নম্রতার পরিচয় দিলো না বরং কারবালাতে থেমে যেতে বাধ্য করল। এবং সেখান থেকে গ্রেফতার করে মক্কায় উপস্থিত করার আদেশ দিল।এখানে এই প্রশ্নটা জানা স্বাভাবিক যে,ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ এমনটা আসলে কেন করল? দামেশকের প্রশাসন থেকে কি তার ওপর কোনো চাপ বা বাধ্যকতকতা ছিল? এমন হওয়া তো সম্ভব নয় কারণ হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাফেলা এরা পৌঁছার পর দশ মহরম পর্যন্ত কুফা এবং দামেসকে কোন চিঠি প্রেরণ সম্ভবই ছিল না দামেশকের প্রশাসনের নির্দেশমতো তার মূল দায়িত্ব ছিল ইরাকের অবস্থা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত রাখা। এবং

সেটা সে ভালোভাবে করতে পেরেছিল কারণ সেখানকার জনগণ তার ভয় তটস্থ ছিল এবং হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন কুফা থেকে চলে যাচ্ছিলেন। এসব আচরণের কারণে তাকে হটকারী বলাই ভালো। সেইসাথে আত্মতুষ্টি ও নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করায় ছিল ইবনে জিয়াদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উমর ইবনে সা'দের কারবালায় রওনা:

ইবনে জিয়াদ প্রথমেই পরিস্থিতি সামলে নিল। সে উমার ইবনে সাদকে তেহরানের গভর্নর বানানোর স্বপ্ন দেখিয়ে এই আদেশ দিল যে,সে যেন কারবালায় গিয়ে হুসাইন (রা:) কে কোন নিরাপত্তার ওয়াদা না দিয়ে গ্রেফতার করে সোজা কুফায় নিয়ে আসে। আর যদি হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ থেকে আত্মসমর্পণ না করে এবং ধরা না দিতে চায় তাহলে যেন ওখানে শহীদ করে দেয়। কিন্তু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বেয়াদবি ও তার উপর হাত তোলা যে কতটা অন্যায় এবং এর পরিণতি যে কতটা ভয়ংকর সেসব ভেবে ওমর ইবনে সাদ ইবনে জিয়াদের কাছে অক্ষমতা ও অপরাগতা প্রকাশ করলো।তবে তাতে খুব বেশি কাজ হলো না। কারণ ইবনে জিয়াদ তার সিদ্ধান্ত থেকে নারাজ ছিল।তাই ওমর ইবনে সাদকে সে খুব হুমকি দিল এবং এই কাজ না করলে বরদান উড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখালো।
ওমর ইবনে সাদ সকাল পর্যন্ত ভেবে দেখার সুযোগ চাইলো।তারপর সে সারারাত বিষয়টির উপর পূর্বাপর নিয়ে ভাবল।শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই জয়ী হলো তার ভেতরে। পরদিন সকালে সেই ইবনে জিয়াদের কাছে এসে কারবালা যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলো এবং সৈন্য নিয়ে রওনা হয়ে কারবালায় পৌঁছল।

কারবালার বদ্ধভুমি:

কারবালার ময়দানে সেনা অফিসার ওমর ইবনে সাদ,শামার ইবনে জিল-জাওশান এবং হুসাইন ইবনে নুমাইর এর সাথে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা হয়। হুসাইন

রাদিআল্লাহু আনহু তখন তাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বললেন আমাকে আমিরুল মুমিনের কাছে যেতে দাও আমি আমার হাত তার হাতে দিয়ে দেব।

উত্তরে তারা বলল আসলে ইবনে জিয়াদের নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া এখন আপনার জন্য দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই।

কুফার সেনাদেরকে হুসাইন (রা:) এর তিনটি প্রস্তাব :

১. যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাওয়ার সুযোগ দান।

২. ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার সুযোগ দান।

৩. অন্য যে কোন জায়গায় চলে যাওয়ার সুযোগ দান।

উমর ইবনে সাদ মেনে নিলো, সে ইবনে জিয়াদকে বিষয়টা জানালো। কিন্তু ইবনে জিয়াদ সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল কোন শর্ত ও সন্ধি ছাড়াই তাকে গ্রেফতার করে আনার নির্দেশ দিল।

একপর্যায়ে আবু মিখনাফার কারণে ইবনে জিয়াদও কিছুটা রাজি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাম্মার দিন জিল জাওশানের বোঝানোর কারণে আবার উল্টা পদক্ষেপ নিল। সাম্মারের ফয়সালা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণে ইবনে জিয়াদ দোষ মুক্ত হয়ে যায় না। সে আসলে ইবনে জিয়াদের মনের কথাটাই বলে দিয়েছিল। অন্যথায় ইবনে জিয়াদ অবুঝ বালক ছিল না,সে সাম্মারের কথার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেবে।

হুসাইন (রা:) কেন গ্রেফতার হতে রাজি ছিলেন না?

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মূলত উদ্দেশ্য ছিল সংশোধন আর তিনি সেই উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধিকে সামনে রেখে ইয়াজিদের হাতে বায়াত হতে চেয়েছিলেন। যেহেতু সংশোধন হওয়ার বিষয়টি ইয়াজিদের হাতেই ছিল। এজন্য তিনি সেখানে যেতে চাচ্ছিলেন। তাছাড়া ইবনে জিয়াদের কাছে তার সার্থ সিদ্ধির কোন উপযোগিতা ও সুযোগই ছিল না।সেই কারণে তিনি ইবনে জিয়াদের হাতে বায়াত গ্রহণের অসম্মত ছিলেন।

কিভাবে বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা?

কথাবার্তা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ওমর ইবনে সাদ যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু ইবনে জিয়াদ কুফায় বসে প্রত্যেকটা মুহূর্তের সংবাদ নিচ্ছিল। সে জুয়াইরিয়া বিন বদর তামিমিকে এই নির্দেশ পাঠালো যে, ওমর ইবনে সাদ যদি লড়াই না করে তবে সেই তার গর্দান উড়িয়ে দেবে। এই সংবাদ শুনে সে সকলকে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তৈরি হওয়ার নির্দেশ গুলো। হুসাইন (রা :) যখন দেখলেন তাদের সাথে এসব কথা অযথা ছাড়া কিছুই না তখন তিনি সাথীদের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন অক্টোবর মাস।হালকা ঠান্ডা আবহাওয়া ছিল প্রকৃতিতে। সেজন্য তার গায়ে ছিল মোটা চাদরে জুব্বা। এরই মধ্যে ওমর ইবনে সাদের এক সৈন্য আমর তহবি নামে বনু তামিমের এক ব্যক্তি প্রথমে হোসাইন (রা:)এর উভয় কাধ বরাবর একটি তীর নিক্ষেপ করল। এটাই যেন ছিল যুদ্ধের ঘোষণা।

ঠিক তখন কুফার অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান আশহুর বিন ইয়াজিদের হৃদয় জেগে উঠলো। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রস্তুত দেখে অফিসারদের তিরস্কার করে বলতে লাগলো, তোমরা কি হোসেন রাদিআল্লাহু আনহুর প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। আল্লাহর শপথ তুর্কি কিংবা দাইলামির কাফেররাও যদি তোমাদেরকে প্রস্তাব দিত তাহলেও তোমাদের জন্য তা প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হতো না।

কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিল না। তারপর হুর বিন ইয়াজিদ তার ঘোড়ার মুখে আঘাত করে হোসেন রাদিয়াল্লাহ আনহু এর দিকে অগ্রসর হলেন। আল্লাহু আনহু ও তার কাফেলার সবাই ধারণা করছিলেন তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে। কিন্তু তিনি যখন নিকটবর্তী হলেন তখন তার ঢাল উল্টে তাদেরকে সালাম করলেন। এরপর ইবনে ইয়াজীদের প্রেরিত বাহিনীর উপর আক্রমণ করে দু'জনকে হত্যা করে এক পর্যায়ে শহীদ হয়ে গেলেন।

হুসাইন (রা :) এর অবমাননা :

এখন উভয় দল নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি হয়ে গেলেন। ইবনে জিয়াদের সৈন্যরা লড়াইকে তীব্রতর করার জন্য ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার সন্তানদেরকে অবমাননা ও তিরস্কার করতে লাগলো। দুর্ভাগা তো বলেই বসলো তোমাদের মধ্যে কি হুসাইন এখনো আছে?

উত্তরে কেউ বলল হ্যাঁ। তখন সে বলল তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও। এরপর হোসাইন(রা :)বললেন কখনোই নয়। বরং আল্লাহ ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল এবং অত্যান্ত দয়ালু,যার আনুগত্য করা হয়।

আচ্ছা! তুমি কে? হুসাইন (রা:) জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জুয়াইরিয়ার সন্তান।

হুসাইন (রা :)এর মুখ থেকে অনিচ্ছা সত্বেও বেরিয়ে এলো, হে আল্লাহ ওকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দাও।এ কথা শুনে সে অত্যন্ত ক্ষীপ্রবেগে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর আক্রমণ করতে চাইলো। কিন্তু সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। তার পা আটকে গেল ঘোড়ার জিনের সাথে বাধা আংটায়। ফলে ঘোড়া তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে ছুটতে লাগল। অবশেষে তার পা টাই জিনে অবশিষ্ট রইল।

পুত্র আব্দুল্লাহর ইন্তেকাল ও যুদ্ধের সূচনা :

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আব্দুল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন। একজন কুফি সৈন্য তাকে দেখে বলল,আমি তো তাকে অবশ্যই হত্যা করব।

অনেকেই তাকে বোঝালো যে, তাকে হত্যা করে তোমার লাভ কি! কিন্তু সে কারো কথা শুনলো না। বরং অস্ত্র উঠিয়ে ছুটল তার দিকে।তখন আব্দুল্লাহ চিৎকার করে বলতে লাগলো-চাচা!

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু আওয়াজ শুনে বলতে লাগলেন এমন ব্যক্তির আওয়াজে লাব্বাইক বলে সাহায্য করার মানুষের চেয়ে শত্রু সংখ্যায় বেশি। এ কথা বলে তিনি সেই ব্যক্তির উপর ঝাপিয়ে পড়লেন এবং তার হাত কেটে ফেললেন।এরপর

দ্বিতীয়বারের আঘাতে তাকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় করে দিলেন। এরপরেই মূলত ব্যাপকভাবে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

কুফার অধিবাসীদের ভীরুতা :

কুফার অধিবাসীদের অনেকেই যুদ্ধের এ দৃশ্য দেখার জন্য সেখানকার টিলাগুলোর কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। তারা খুব ভারাকান্ত হয়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিল এবং হুসাইন (রা:)য়ের সাহায্যর জন্য দোয়া করছিল। কিন্তু তাদের ভয় এতটাই ছিল যে হুসাইন (রা:) কে সহযোগিতা করার সাহস পাচ্ছিল না। কেউ কেউ তাদেরকে বলেও ছিল, হে আল্লাহর দুশমন, ওখান থেকে এসে কেন হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে সাহায্য করছো না? কিন্তু তারা এর কোন প্রতিক্রিয়া বা উত্তর কিছুই জানালো না। সে সময় হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে শখানেক লোক ছিল। তাদের মধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাঁচ ছেলে ও বনু হাশেমের ১৬ সদস্য ছাড়াও বনু সুলাইম ও বনু কেনানার মিত্ররা ছিল.ইবনে ওমর ইবনে জিয়াদ নামেও এক ব্যক্তি তাঁদের সাথে শামিল ছিল।

হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর শাহাদাত:

প্রচন্ড যুদ্ধে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সকল সাথীই শহীদ হয়ে যান। তাদের মধ্যে দশজনের বেশি যুবকই ছিল তার পরিবারভুক্ত। একটি তীরে সে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোলে থাকা নিষ্পাপ শিশুটিকেও আঘাত করল। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু রক্ত মুছতে মুছতে বললেন,হে আল্লাহ, আমাদের এবং তাদের মাঝে তুমি ইনসাফের ফায়সালা করে দাও.এরা তো আমাদের ডেকেছিল যে আমাকে সহযোগিতা করবে। কিন্তু এখন সেই তারাই আমাদের হত্যা করছে।

হুসাইন (রা:) দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারছিলেন যে, এরা শুধুই আমাকে হত্যাই নয় বরং আমার লাশ থেকে কাপড় খুলে নিতে দ্বিধাবোধ করবে না। তাই তিনি স্ত্রীর থেকে একটি পুরাতন চাদর চেয়ে নিয়ে সেটি আবার ছিঁড়ে কাপরের নিচে পড়ে নিলেন।

এরপর তলোয়ার নিয়ে বের হয়ে গেলেন। এরপর খুব জোরদার হামলা হল। অবশেষে লড়াই করতে করতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে গেলেন।
হত্যাকারিরা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেহ মোবারক থেকে মাথা আলাদা করে ফেলে এবং সেই পুরাতন চাদরটা ছাড়া বাকি সব খুলে নিয়ে যায়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কারবালার শহীদগন :

যুদ্ধে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আবু তালেব পরিবারের ১৮ জন সদস্য শহীদ হয়েছিলেন।
হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছয় ভাই :১. আব্বাস,২. জাফর, ৩. উবাইদুল্লাহ,8, উসমান, ৫. মুহাম্মাদ ও ৬. আবু বকর।
হুসাইন(রা:)য়ের দুই সন্তান :১. আব্দুল্লাহ ২. আলী আকবার ।
হাসান (রা :) য়ের তিন সন্তান +১. জাফর, ২. আব্দুর রহমান, ৩. আব্দুল্লাহ।
এবং হজরত আকিল রহ: য়ের দুই পৌত্রি :আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ও ২. মুহাম্মদ ইবনে আবু সাঈদ ইবনে আকিল।
আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর আবি তালিন (রা :)য়ের দুই সন্তান :১. আউন ও ২. মুহাম্মাদ। আর উমর ইবনে সাদের সৈন্য মারা গিয়েছিল ৮৮ জন।হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর আরেক সন্তান আল্লাহু আনহুর জাইনুল আবেদীন সেই সময় অসুস্থ ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ২৩ বছর। ওমর ইবনে সাঈদ তার সৈন্যদেরকে বলল, এই অসুস্থ ছেলেটাকে কিছু করোনা।

হত্যাকারীদের হঠকারী কবিতা :

হত্যাকারীরা হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর মাথা নিয়ে কুফার রাজ প্রাসাদে করলো এবং ইবনে জিয়াদকে সুসংবাদ জানিয়ে এই কবিতা আবৃত্তি করলো :
আমাকে দাও ভরে দাও স্বর্ণ চাঁদি রুপা

কারণ আমি হত্যা করি নামকরা সব নেতা
শ্রেষ্ঠ বাবা-মায়ের সন্তান করি বধ
বংশে শৌর্য্য শ্রেষ্ঠ শুমার যাদের ওয়াক্ত।

ইবনে জিয়াদের সামনে হুসাইন (রা:) এর মাথা :

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা মোবারক একটি পাত্রে রেখে ইবনে জিয়াদের সামনে পেশ করা হল। তার চুলে তখন খেজাব লাগানো ছিল। কাটা মাথা দেখে তার ভেতর কোন প্রভাব পড়ল না। তার অন্তর পাথরের মত শক্ত ছিল। উল্টো সে তার হাতের দন্ড দিয়ে নাকে খোঁচা দিয়ে বলল,দেখো আবু আব্দুল্লাহর চুলদাড়ি সাদা হতে শুরু করেছিল।এরপর সে দন্ডটির ঠোঁটের উপর রেখে বলল,তার নাকটা তো ভারি সুন্দর! তখন সেই মজলিসে অনেক বড় বড় বুজুর্গ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, শোনো আমি, রাসুলুল্লাহ (সা:)কে এখানে চুমু দিতে দেখেছি যেখানে তুমি দণ্ডটি রেখেছো।

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে নবীপরিবারের নারীগণ:

উমর ইবনে সা''দ যুদ্ধশেষে হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর পরিবারের নারীদেরকে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে কুফায় পাঠিয়ে দিলো। ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ পাথর মনের হওয়া সত্ত্বেও নবী পরিবারের নারীদের সাথে কোন খারাপ আচরণ করেনি। বরং আলাদা একটি ঘরে খাবার দাবার ও প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের ব্যবস্থা করে দিল।

ইবনে জিয়াদ আসলে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিটি নড়াচড়া কে বিদ্রোহ হিসেবে ধরে নিয়েছিল। তার দর্শন অনুযায়ী হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহু তার সকল পুরুষ সঙ্গী সাথী বিদ্রোহীদের কাতারে শামিল ছিল। ছোট ছোট শিশু ও নারীরা ছিল এই আওতার বাইরে।এজন্য সে তাদের শাস্তির উপযুক্ত মনে করেনি।

যাইনুল আবেদীন ও আব্দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ :

হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর পরিবারভুক্ত সকল পুরুষই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার ছেলে আলি ইবনে হুসাইন যিনি জয়নুল আবেদিন নামে পরিচিত, শুধু তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। কারণ সে সময় তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন। হলে যুদ্ধের জন্য তাবু থেকে বের হতে পারেননি।

তিনি যখন নারীদের সাথে কুফায় ইবনে জিয়াদের কাছে এলেন তখন তাকেও বিদ্রোহী মনে করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল।কিন্তু তার ফুফু যায়নাব বিনতে আলী অত্যন্ত সাহসী ও সংগ্রামী ছিলেন। আলী ইবনে হোসাইনকে জড়িয়ে ধরে বললেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তোমরা হত্যা না করবে ততক্ষণ একে হত্যা করবে না। এই অবস্থা দেখে জিয়াদের দয়া উথলে উঠলো এবং তাকে ছেড়ে দিলো।সবাইকে ইয়াজিদের কাছে দামেসকে পাঠিয়ে দিল।

ইয়াজিদের কাছে নবীপরিবারের নারীগণ :

নবী পরিবারের নারীগণ যখন দামেশক ইয়াজিদের কাছে পৌঁছলেন তখন ইয়াজিদ ও এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য খুব আফসোস প্রকাশ করেছিল।

হযরত ফাতেমা বিনতে হোসাইন বললেন,হে ইয়াজিদ রাসূল (সা:) য়ের কন্যাদের কি তুমি বন্দি করে রাখবে?

এ কথা শুনে ইয়াজীব কাঁদতে শুরু করলো। সেই সাথে উপস্থিত অনেকেই এত পরিমান কাঁদলো যে, আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল।

ইয়াজিদ নারীদের জন্য উত্তম খাবার পরিচ্ছদ সহ অনেক কিছুর ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর তারা যখন সকলেই মদিনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল তখন আলী ইবনে হুসাইনকে ডেকে বলল, ইবনে মারজানার (উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের) উপর যানত বর্ষিত হক। আল্লাহর শপথ, হুসাইন (রা:) যদি আমার কাছে আসতেন তাহলে তিনি আমাকে যাই বলতেন আমি তা মাথা পেতে নিতাম। এজন্য যদি আমার কোন সন্তানও নিহত হতো তাহলেও আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত

তাই ছিল,যা আপনি দেখছেন। আপু আপনার যখন যা প্রয়োজন হবে, আমাকে শুধু লিখে পাঠিয়ে দিবেন।

ইয়াজিদ বনু হাশেমের প্রত্যেক সদস্যকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করল, যুদ্ধের সময় কি আপনাদের কিছু হারিয়েছে?

তখন তারা যা হারানোর কথা বলেছিলেন ইয়াজীদ তার দ্বিগুণ দিল।

তাদের কাফেলাকে মদিনায় পৌঁছানোর জন্য খুব বিশ্বস্ত এক ব্যক্তিকে নির্ধারণ করল। তাকে সকলের সাথে উত্তম আচরণের ওসিয়ত করল তাদেরকে তারা সুন্দরভাবে মদিনায় পৌঁছে দিলে ফাতেমা ইবনে আলী কাফেলা প্রধানকে তার গয়নাটি খুলে দিয়ে দিলেন।আর বললেন তেমন কিছু আপনাকে উপহার দিতে পারছি না বলে ও ওর পেশ করছি।উত্তরে কাফেলা প্রধান বলল যদি শুধু দুনিয়ার কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই উত্তম ব্যবহার হতো তাহলে এই অলংকারের চেয়েও স্বল্পমূল্যের কোন জিনিস আমাকে খুশি করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু আমি শুধু আল্লাহর জন্য এবং তার রাসুলের আত্মীয়তার কারণে এমনটা করেছি।

যদি নবীজির জিজ্ঞেস করেন তাহলে কী উত্তর দেবে?

এই কাফেলা যখন মদিনায় প্রবেশ করলো তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অনেকে এলো। যায়না বিনতে আকিল কাদতে কাঁদতে এই কথাগুলো আবৃত্তি করছিলেন যে, হে লোক সকল, তখন তোমরা কি উত্তর দেবে? যদি পয়গাম্বার তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে আখেরি উম্মত হয়ে তোমরা একি করলে?আমার পর আমার সন্তান ও পরিবারের সাথে কেমন আচরণ করেছ?যখন তাদের মধ্যে থেকে কেউ বন্দী হয়েছে,কেউ শহীদ হয়ে ধুলো মাটিতে গড়াগড়ি করেছে।আমি তোমাদেরকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছি তার প্রতিদান তো এই ছিল না যে আমার পর আমার আত্মীয়দের সাথে অপ্রত্যাশিত বা মন্দ কোন আচরণ করবে।

হযরত আব্দুল আসআদ দুয়ালির (মৃত্যু :৬৯ হিজরি) কাছে যখন এই পংক্তি গুলো পৌঁছলো তখন তিনি বললেন, আমরা এটাই বলব যে,হে আমাদের রব,আমরা নিজেরা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলেছি।যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা এবং দয়া না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

কারবালার ইতিহাস সম্পর্কিত হাদিস

আনাস (রা :) বলেছেন :

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের সামনে হুসাইন(রা:) য়ের কর্তিত মাথা একটি থালায় উপস্থাপন করা হলো। তখন ইবনে জিয়াদ একটি ছড়ি দিয়ে হুসাইন এর মাথায় খোঁচাখুঁচি করতে লাগলো এবং তার সৌন্দর্য নিয়ে কিছু কথা বলল। তখন আনাস বললেন, এই চেহারা (যাকে তুমি অপমান করছো)রাসূল (সা :)য়ের চেহারার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। (সহীহ বুখারী, ৩৭৪৮)

কারবালার ইতিহাসের সম্পর্কিত আয়াত :

কারবালাই ইমাম হোসাইন (রা:)আনহু এবং অন্যান্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সম্পর্কিত আয়াত :

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না।বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বোঝনা।সূরা বাকারা ১৫৪

অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ :

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে।আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। সূরা হজ্জ ৩৯

আহলে বাইতের নবী পরিবারের মর্যাদা:

হে নবী পরিবার আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূত-পবিত্র করতে। সূরা আহযাব ৩৩
বলুন আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সৌহার্দ ছাড়া আর কোন প্রতিদান চাই না।সূরা শূরা ২০

জুলুমের পরিনাম ও সত্যের বিজয় :

আল্লাহ যার হত্যা নিশ্চিত করেছেন, তোমরা তাকে হত্যা করো না। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত কারণে। আর যে অন্যায় ভাবে নিহত হয় আমি তার ওয়ারিশকে ক্ষমতা প্রদান করেছি। সূরা বনী ইসরাইল ৩৩
হে প্রশান্ত আত্মা তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে যাও সন্তোষভাজন হয়ে।অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। সুরা ফাজর ২৭ থেকে ৩০

কারবালার দুর্ঘটনার দায় কার?

সবশেষে এই প্রশ্নটা থেকেই যায় কারবালার এই দুর্ঘটনার দায় আসলে কার? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সালাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার মাত্র ৫০ বছরের মাথায় তার বংশধরদের রক্ত রঞ্চিত করল কে?
আসলে কোন এক ব্যক্তির উপর এই দায় চাপিয়ে দেয়া যায় না। বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে একাধিক দল ও ব্যক্তি। সামনে আমরা সেই দায়ী দল ও ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করব।

কুফার অধিবাসী :

তারা হুসাইন রাদিআল্লাহ আনহুর সাথে অসংখ্য বার ওয়াদা করে আহবান করেছে এবং পরবর্তীতে ধোকা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।সাহাবায়ে কেরাম এবং উম্মতের ব্যক্তি সম্পন্ন আলেমদের আলোচনা ঘাটলে স্পষ্ট হয় যে, তাদের যত ক্রোধ সব ঐ কুফা বাসীদের প্রতি। যুদ্ধকালীন উচ্চারিত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এই বাণিটিও বিশেষ চিন্তার দাবিদার যে, হে আল্লাহ তুমি তাদের এবং আমাদের মাঝে ন্যায় বিচার করে দাও। এই তারাই আমাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে আহ্বান করেছে কিন্তু এখন তারাই আমাদের হত্যা করছে।

এই বাক্যের উদ্দেশ্য কখনো ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ,আমর ইবনে সাদ প্রমুখ হতে পারে নাm কারণ তারা তাকে আহবান করেনি। সুতরাং তার স্বচ্ছ ইঙ্গিত হলো কুফার সেনাপতি এবং সৈন্যদের মধ্যে হযরত আলী ভক্ত শিয়াদের এমন কিছু লোক যারা হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠি লিখেছিল।কিন্তু এখনো ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে নিয়েছে।

আলী ভক্ত শিয়াদের মধ্যে যারা হুসাইন(রা :) এর হত্যার শরিক ছিল:

ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে প্রমাণিত যে, আলী ভক্ত শিয়ারা হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডে শরিক ছিল।

১. আমর ইবনে হাজ্জাজ : সে কারবালায় ইবনে জিয়াদের সৈন্যদের মধ্যে শামিল ছিল। এবং চিৎকার করে বলছিল হে লোক সকল, এই লোকটাকে হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করো না।

২. সম্মার বিন জিল যাওশান : সে ইবনে জিয়াদের সৈন্যদের নায়েব ছিল।এই লোকই হুসাইন (রা:) য়ের সাথে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছিল।

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে জহির ইবনে সালেম : কুফার সৈন্যদের একটা অংশ ছিল তার নেতৃত্বে সে ছিল প্রসিদ্ধ আবু মিখনাফের নানার বাবা।

৪.কায়েস ইবনুল আশআশ:সে সাম্মারের আদেশে আচ্ছা বর্শা নিক্ষেপ করেছিল।

৬. খাওলা বিন ইয়াজিদ : সেই হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা শরীর থেকে আলাদা করেছিল। হিময়ার সাথে তার বেশ সক্ষ্য ছিলো। যারা মূলত ইয়েমেনের গোত্রভুক্ত ছিলো এবং সেখান থেকেই আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার জন্ম হয়েছিল। এবং শিয়া ধর্মের আদিখ্য ছিলো।

এখন প্রশ্ন উঠে যে তারা কেন হোসাইন রাদিআল্লাহুআনহুকে হত্যার ইচ্ছে করেছিল? তারা তো ইচ্ছে করলে আহত করে বেঁধে নিয়ে যেতে পারত। যদি চিন্তা করা হয় তাহলে মনে হয়,আসলে তাদের ভেতর ভয় কাজ করছিল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি জীবিত থাকেন তাহলে সকল রহস্য আবার না ফাঁস হয়ে পড়ে। কারণ তাদের লিখিত চিঠিও তার কাছে ছিল। যদি ইবনে জিয়াদের কাছে চিঠি পৌঁছে যেত তাহলে তাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়তো। সে কারণে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে যাওয়ার পর কোন চিঠি পাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি ধোকা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কোন অবশিষ্ট থাকেনি।তাই তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও মুক্তি পেয়ে যায়।

আমর ইবনে সাদ :

হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর উপর হামলা এবং সৈন্যদের নেতৃত্ব তার হাতেই হয়েছিল। শুরুতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী না থাকলেও গভর্নর হওয়ার স্বপ্ন তাকে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে ফেলে। সে মনে করেছিল বিষয়টি রক্তপাত পর্যন্ত না গড়িয়ে সমাধান করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত রক্তপাত না ঘটানোর পক্ষেই ছিল এবং সহজ সমাধান খুঁজছিল। আমর ইবনে সাদ হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর সাহাদাতের কারণে এত বেশি কষ্ট পেয়েছিল কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি ভিজে উঠল।মোটকথা আমর ইবনে সাদ এ কাজ খুশী মনে করেনি।কিন্তু এর পরেও সে তো শরীক ছিল এবং সৈন্যদের নেতৃত্বও তার হাতেই ছিল।

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ :

সে আসলে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহী মনে করতো এবং এবং তার প্রতি খেয়াল ও সুযোগের প্রতি লক্ষ্য না রেখে তার বিরুদ্ধে হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্তৃত মাথা দেখেও তার মধ্যে কোন ভাবান্তর হয়নি।ইয়াজিদ নোমান ইবনে বাশিরের নম্রতার কারণে তাকে নিয়োগ করেছিল কুফা নিয়ন্ত্রণের জন্য। ইয়াজিদ কাকে সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল। যার জন্য ইবনে জিয়াদ এসব করার দুঃসাহস পেয়েছে। অবশ্য জিয়াদের জুলুম অন্যায় পদক্ষেপ দেখে ইয়াজিদ খুশি হয়নি। বরং বলেছে ইবনে জিহাদ হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা খুব দ্রুতই নিয়ে ফেলেছে এবং হত্যা করেছে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন।

কারবালার ঘটনা ও ইয়াজিদের কীর্তি :

প্রমাণ পাওয়া যায় ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ নিজের ইচ্ছাতেই হুসাইন রাঃ কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ লিখেছেন সকল বর্ণনাকারী এ ব্যাপারে একমত যে, ইয়াজিদ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে হত্যার নির্দেশ দেয়নি।

তার যুদ্ধের নির্দেশই ছিল হুসাইন রাদিয়ালাহু আনহুর শাহাদাতের কারণ। তাই বলে পূর্ণরূপে মুক্ত ও সম্পর্কহীন নয়। দুনিয়ার কোন আদালতে কারবালায় নিহতদের নিয়ে কোন মামলা দায়ের করা হলে ইয়াজীদ মুক্তি পেয়ে যেত ঠিকই কিন্তু চারিত্রিক বিবেচনায় এবং প্রচলিত সমাজ নীতিতে সাধারণ মানুষের আদালতে সে কখনোই মুক্তি পেত না।আর আখেরাতের ফায়সালা তো আছেই।যদি মেনে নেয়া হয় যে ইয়াজিদ হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করতে চাইনি তাহলে একথা মানতে হবে যে জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। কারণ সে এই পুরো ব্যাপারটাই বড় বড় ভুল করেছে। যদি ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদকে স্পষ্ট ভাষায় এই নির্দেশ দিত যে বনু হাশেমের সকল সদস্যকে সসম্মানে দামেসক পাঠিয়ে দিতে তবে এমন দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতোনা।

যখন দেশের লোকজনের জীবন ও ইজ্জত আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতে থাকে সেজন্য শাসককেই দায়ী করা হয় এবং এটা অনৈতিক কিছু নয়।এর জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক নিজেকে অপরাধী ভাবতে থাকবে এবং আখেরাতের ভয়ে কাপতে থাকবে।

ইয়াজিদ সেই সময়ও মজবুত অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল মুসলমানগণ তাকে সেই হিসেবে শাসক মেনে নিয়েছিল কিন্তু ইয়াজীদ দুঃখজনকভাবে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য শুধু একটু শোক প্রকাশ এবং ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে গালমন্দ ছাড়া কিছুই করেনি। তকিছুর পরেও ইয়াজিদের প্রতি মানুষের যেই ঘৃণার জন্মেছিল তা খুব কমই ছিলm কারণ সাধারণ মানুষ এটাই মনে করেছিল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতে সন্তুষ্ট।এ কারণেই ইসলামী দেশগুলোতে বনু উমাইয়া খলিফাদের প্রতি চরম ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জনগণ বারবার তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসছিল ইয়াজিদ নিজেও এই ঘটনার পরিণতিতে এমন অসন্তোষের শিকার হয়েছিল। যা থেকে পরিত্রান পাওয়া ছিল অসম্ভব।

এই সমস্যার সমাধান কী?

এতক্ষণের আলোচনায় এটা প্রমাণিত যে উভয়ের মাঝে রাজনৈতিক বৈপরীত্য বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল প্রশাসনের যেই ভুল বোঝ ছিল তার সমাধান কেবল সামনাসামনি কথা বলার দাঁড়ায় সম্ভব ছিল। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নিজেও কারবালায় সমস্যা দেখলেন ইয়াজিদের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন mইয়াজিদ নিজেও সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর বারবার আফসোস প্রকাশ করেছে হায়!যদি আমি আগেই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আলোচনা করতাম এবং তার চাওয়া মেনে নিতাম!ইয়াজিদ যদি সত্যি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অবস্থান বোঝা ও তার কথা শোনার জন্য আদর ও সম্মানের সাথে নিজের কাছে দেখে নিতো অথবা তার সাথে সরাসরি কথা বলার জন্য সে নিজেই হিজাব সফর করত এবং হৃদয় প্রশস্ত করে কাজ করত তাহলে এই সমস্যাটা সমাধানের শতভাগ সম্ভাবনা ছিল।

মোটকথা ইয়াজিদের এই আফসোস ও অনুশোচনা তার ভেতরেই থেকে গেল সে ইবনে জিয়াদ,আমর ইবনে সাদ।সাম্মারসহ অনেকের বিরুদ্ধে কিছু করারই সাহস পেলো না।

বরং ভেতরেই আফসোস পুষতে থাকলো। তাই বলে এই অনুষচনা তাকে মুক্তি দিতে পারল না। বরং এরপর থেকে একের পর এক সে অমার্জনীয় সব অন্যায় করে যাচ্ছিল।মদিনা ও মক্কায় সৈন্য নিয়োগ করলো। সেই হত্যাকাণ্ডের পর সৈন্যরা যা যা করল তাতে ইয়াজিদের বদনাম আরো বেড়ে গেল। দিন দিন তা বোরাক গতিতে বাড়তে থাকলো।

কারবালার ঘটনা: ইতিহাসের শিক্ষা

আমাদের আকিদা বিশ্বাস হলো আল্লাহ তা'আলারজ্ঞান, প্রজ্ঞা,শক্তি ও ক্ষমতায় পরিপূর্ণ। সবকিছুই তার একক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়। কোন কিছুই তার আদেশ ছাড়া হয় না। আর তার আদেশে কোনো না কোনো কল্যাণ থাকে। কারবালার হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনায় যখন আমাদের অন্তর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় তখনও ভাগ্যের উপর বিশ্বাস আমাদের ধৈর্য ধরতে শেখায়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পেছন পর্দায় আসলে কি হেকমত ছিল?আল্লাহ তালায় তা সবচেয়ে ভালো জানেন। আমাদের মত দুর্বলদের দ্বারা সেসবের কাছে ধারে যাওয়া সম্ভব নয়।তবে বহু ভেবে চিনতে আমাদের কাছে সেই ঘটনার কিছু হেকমত ধরা দেয় :১. আল্লাহতালা জানতেন যে দুর্বল ইমানের অধিকারীগণ হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পরিবার-পরিজনকে মনুষ্য স্বভাবের ঊর্ধ্বে ধারণা করতে শুরু করেছিল। কারবালার ঘটনার পর যারা সত্যান্বেষী তাদের চোখ খোলার মত একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ সামনে এসে গেল যদি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলে অদৃশ্যের বিষয় জানতেন তাহলে কখনোই কুফার পথ ধরতেন না। এমন মাজলুম অবস্থায় শহীদ হতেন না। বরং সামান্য এক ইশারায় সকল অবস্থার পরিবর্তন করে দিতে পারতেন।

২. এই ঘটনা মানুষকে সর্বাবস্থায় আল্লাহতালার সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার উপর রাজি ও সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দেয়।আল্লাহ এমন না করুক যে কোন সময় যে কারো উপর মারাত্মক বিপদ আসতে পারে,ব্যর্থতা বারবার আঁচল আঁকড়ে ধরতে পারে,ঋণ ও বোরাক গতিতে বেড়ে যেতে পারে,অসুস্থতা কিছু ধাওয়া করতে পারে। মোট কথা এমন যেকোন বিপদ যে কারো উপর যখন তখন আসতে পারে। কিন্তু তাই বলে সাহস

হারালে চলবে না। হুসাইন রদিআল্লাহু আনহুর মত মানুষকে যখন শহীদ হতে হয়েছে তাহলে আমরা কোন ছার!

৩.রাজনৈতিক ইসুগুলোতে অনেক দিকের সম্ভাবনা থাকে।শরীয়তের সীমা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের নিয়ম শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পদস্থলন হতে পারে। মানুষের হকের জন্য জবাবদিহি করতে হতে পারে পদে পদে। ভুলের কারণে আল্লাহ তালার কাছে পাকড়াও হতে পারে।আল্লাহতালার ইচ্ছে ছিল যে সায়েদগণ সব সময় সম্মানিত প্রিয় থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সুনাম ও সুখ্যাতি থাকবে।আল্লাহতালা তাই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ সায়েদকে রাজনৈতিক অরাজকতার সময় পৃথক করেছি দিলেন।

৪. সাইয়েদদের থেকে উম্মতকে ইলমি ও আর্থিকভাবে তরবিয়তের জন্য আল্লাহ তা'আলা হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরে বনে ফাতেমার বেশ কজন বুজুর্গকে বের করলেন এবং তাদেরকে সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে রাখলেন। ফলে ধীরে ধীরে তারা পূর্ণ ইলম ও আধ্যাত্মিক তরবিয়তের কাজে মশগুল হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:) এর এরশাদ :

এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রদিআল্লাহু আনহুর কথা স্মরণযোগ্য - বনো হাসেমের মাধ্যমে এই দিনের সূচনা হয়েছিল এবং বনো হাশেমের হুকুমতের উপরই তা শেষ হবে। সুতরাং তোমরা যখন দেখবে যে বনো হাসেম পুনরায় নেতৃত্বে এসে গেছেন বুঝবে সময় শেষ হয়ে এসেছে (কেয়ামত চলে এসেছে)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:)এর সত্য উচ্চারণ এবং ইয়াজিদের পক্ষ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরী :

অধিকাংশ সাহাবী সেই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অবস্থার পূর্ণ পরিবর্তন না ঘটিয়ে মানুষকে সঠিক বিষয় জানিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে রাসুলের হাদিসের আলোকে সঠিক বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করাই উত্তম মনে করেছেন। সেই সাথে উত্তম মনে করেছেন যে এইরকম অবস্থায় রাসূলের শিক্ষা কি লোকদের তা জানিয়ে দেবেন।আব্দুল্লাহ ইবনে

আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন এই মহান সাহাবী কাফেলারি একজনm তিনি শামে থাকতেন এবং নিজ মহল্লার মসজিদে হাদিসের দরস নিতেন।কখনো কখনো দরস চালাকালীন আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন শাসকদের অপতৎপড়তার কথাও বলতেন।একবার তিনি বললেন কিয়ামতের একটি আলামত হলো মন্দ লোকদের প্রধান হবে এবং ভালো মানুষদের দাবিয়ে রাখা হবে। ইয়াজিদ তাকে সব সময় খুব কড়া ভাবে পর্যবেক্ষণ করত। কিন্তু তিনি হাদিস পাড়ানো চালিয়ে যান একবার তিনি হাদিস শোনাচ্ছিলেন।এমন সময় ইয়াজিদের একজন সিপাহি এসে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে গেল।তখন তিনি বললেন দেখো সে এই কারণেই এসেছে যেন আমি নবীজির হাদিস শোনানো বন্ধ করে দিই।

ইয়াজিদের হাতে হুসাইন (রা :) এর পবিত্র মস্তক মোবারক বেয়াদবির শিকার হয়েছিল কী?

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের একজন আজাদকৃত গোলাম বলেছেন, যখন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর খন্ডিত মস্তক মোবারক দরবারে পেশ করা হলো তখন আমি ইয়াজিদকে কান্নারত অবস্থায় দেখেছি। সে একথা বলছিল যদি ইবনে জিয়াদের সাথে হোসাইন (রা:) এর কোন আত্মীয়তা থাকতো তাহলে সে এমন কাজ কখনোই করতে পারত না।

এছাড়াও সায়েদ বংশের জীবিত সদস্যদের দেখেই ইয়াজিদের নত হয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে যথোপযুক্ত সম্মানের চেষ্টা করা ইতিহাসের বর্ণনায় বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এ।খন এটি ভাবা অত্যন্ত কঠিন যে সায়েদ বংশের লোকদের প্রতি একদিকে সে সম্মান প্রদর্শন করছে অপরদিকে হত্যাকাণ্ডের আদেশ পাঠিয়েছে।ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ইয়াজিদের দরবারে যে সকল সাহাবী উপস্থিত থাকার বর্ণনা প্রদান করে বিভিন্ন রেওয়ায়েত তৈরি করা হয়েছে। যেমন আবু বারজা আসলামী এবং খন্ডিত মস্তকের সাথে বেয়াদবি মূলক গল্পগুলো তৈরি করা হয়েছে। বাস্তবে এই সকল সাহাবী সেই সময় সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলে উপস্থিতিই ছিলেন না।

ইয়াজিদের সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:

কারবালার ঘটনা ইয়াজিদের শাসনামলকে এমনভাবে কলঙ্কিত করেছে যে, তার সময়কার অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমও মানুষের দৃষ্টি আড়ালে চলে গিয়েছে। অথচ সেই সময় আফ্রিকা, খোরাসান ও তুর্কিস্থানে সামযরিক অব্যাহত ছিল। ওখানকার মিশনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বে অধিকাংশ সময় সেই জেনারেলরাই ছিলেন, যারা হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর যুগ থেকে ইসলাম প্রচারের এই মহান মিশনে যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ,জুনাদা ইবনে উমাইয়া, মুনযির ইবনে জারুদ, সিসান ইবনে সালামা, উকবা ইবনে নাফে, জহির ইবনুল কায়েস, আবুল মুহাজির দিনার উল্লেখযোগ্য ছিলেন। অভ্যন্তরীণভাবে সরকারি সৈন্যরা যেই বাড়াবাড়ি করছিল তা তো অবশ্যই আপন জায়গায় নিন্দাযোগ্য, কিন্তু বাইরের মিশনগুলোতে খানিক ব্যর্থতা মাঝেমধ্যে দেখা দিল বেশ কিছু সাফল্যও অর্জন করেছিল।

হুসাইন (রা:) এর রক্ত কী হালাল ছিলো?

সাহাবীদের ঐক্যমত এই মাসালা গৃহীত হয়েছে যে বৈধ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় সরকার ও বিদ্রোহীদের মাঝে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেখানে জান ও মালের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণ দাবি করে না ইসলামে আদালত।

শরিয়া ক্ষতিগ্রস্তপক্ষকে মাফ করে দিতে বলে। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যদি বিদ্রোহী প্রমাণ করা যায়, তাহলে শুধু আলোকিত বিধান অনুযায়ী হত্যাকারী নিস্তার পাবে। বিদ্রোহ প্রমাণের জন্য কোন একটি অঞ্চল দখল করা প্রাথমিক শর্ত। যা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু করেননি। পরবর্তীতে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মত দিয়েছিলেন যে, সাক্ষাৎ করে সমাধান করে নিলে আমি তার আনুগত্য স্বীকার করে নিব।এজন্য প্রতিপক্ষের কিছু চিন্তাশীল ও দূরদর্শী সেনা অফিসার শেষ সময় হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে এসে দাঁড়ায় এদের মাঝে বিশেষভাবে হারব বিন ইয়াজিদ উল্লেখযোগ্য কেননা হক ও বাতিল পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরপর ইয়াজিদ কর্তৃক প্রেরিত সরকারি বাহিনী মদিনা থেকে আগত সম্মানিত কাফেলাকে রেহাই দেয়নি। এই লড়াইকে কখনোই একটি যুদ্ধের সংজ্ঞায় ফেলনা ফেলা

যায় না। যেখানে একদিকে চার হাজার প্রশিক্ষিত সেনা সদস্য অপরদিকে নারী শিশুসহ হাজার মাইল সফরকারি একটি অসহায় কাফেলা। একে সেনাবাহিনীর ঘোষনা দিয়ে আক্রমণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

এমন পরিস্থিতিতে দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে মজলুম ব্যক্তিরাও শেষ ভরসা হিসেবে অস্ত্র উঠিয়ে নেবে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে একপাক্ষিক ছিল যাকে যুদ্ধাবস্থা কোনভাবে বলা যায় না।হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে লড়াইরত অবস্থায় নয় বরং সিজদারত অবস্থায় মস্তক পেতে নিয়ে শহীদ করা হয়েছে হত্যাকারী অবশ্যই জালেম এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত হত্যার উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয়েছে।ফলে হত্যাকারী কিসাসযোগ্য অপরাধী।

এজন্য হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকান্ড কিসাসের বিধান ব্যতিত ভাবা সম্ভব নয়।

হুসাইন (রা:) য়ের কাফেলার জন্য করে পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল?

এই ঘটনাটি আবু মিখনাফ কর্তৃক সাজানো নাটক। তবে তা আমাদের কাছে গুরুত্ব রাখে না। কাউকে অভুক্ত করে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা অথবা খাইয়ে দায়য়ে তর তাজা করে হত্যা করা কোন পার্থক্য রাখেনা। বিষয়টি তো আদতে একই। যদি পানি সরবাহের ব্যাপারটি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে কারবালার শহীদদের উপর জুলুম একটু কমানো যাবে বলে মনে করছেন কি? এভাবে কি ইয়াজিদ, ইবনে জিয়াদ এবং অন্যান্য শাসকদের উদারতা ও মহানুভতা প্রমাণিত হবে? যখন কোন বাহিনী অপরপক্ষকে ঘেরাওয়ের মধ্যে রেখে পানির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, তখন তাদের উদ্দেশ্য থাকে তাদের খুৎ পিপাসায় কাতর করে যেন বিনা যুদ্ধে সবাই অস্ত্র সমর্পণ করে। যুদ্ধের কোন প্রয়োজনই যেন না দেখা দেয় অপরদিকে কোন বাহিনী প্রতিপক্ষকে ঘেরাও এর মধ্যে রেখে আঁচানক হামলা করে বসে তাহলে বুঝতে হবে প্রতিপক্ষকে যে কোন মূল্যে মিটিয়ে দেওয়ায় তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

সুতরাং পানি বন্ধ করার ঘটনাটি প্রমাণিত না হলে ইয়াজিদ এবং তার পাপিষ্ট গর্ভনরদের উপর থেকে জুলুমের ফিরিস্তি একটুও ও কমবে না। বরং কিছু কিছু বিষয়ে তাদের পাপাচার ও নির্মমতা আরও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হবে।

শিয়ানে আলী সরকারি বাহিনীতে কিভাবে যোগদান করলো?

কুফার জনগনের মাঝে হযরত আলীর পক্ষবলম্বনকারী ব্যক্তিরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর । তাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব থেকে সরকারি চাকরিতে যোগ ছিল। বেশ কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা মোতাবেক কুফা বাসীদের মাঝে ১৬ থেকে ১৮ অথবা ৩০ হাজার সরকারি চাকরিজীবী ব্যক্তি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল। হোসাইন বিন আব্দুর রহমানের বর্ণনা মতে এই সংখ্যাটি ছিল এক লাখ।

সেই সময় সমগ্র কুফার জনসংখ্যা সর্বসাকুল্য তিন থেকে চার লাখ ছিল।তাদের মাঝে প্রায় এক লক্ষ জনগণ হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহযোগিতার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল।এর অর্থ হল ফুফার অধিকাংশ যুবক ও নবীন হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর পক্ষ গ্রহণ করেছিল।স্পষ্ট বোঝা যায় এদের মাঝে অনেকেই সেনাবাহিনীর সদস্য,অফিসার ও কমান্ডার ছিলেন।যখন উমর ইবনে সাদকারবালায় সৈন্য প্রেরনের সেনা সদস্যদের একত্রিত করছিলেন,স্বাভাবিকভাবেই এদের মধ্যে থেকেই বেশ কিছু সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই সদস্যরা কিছুদিন পূর্বে আহলে বাইতের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল! কিন্তু এখন সরকারি বাহিনীতে চাকরির কারণে তারা ভীত হয়ে ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের আদেশে কারবালা অভিমুখে এগিয়ে যায় এবং গাদ্দারির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় করে।

কারবালায় প্রেরিত বাহিনী কুফায় ছিলো নাকি সিরিয়া থেকে প্রেরিত?

কুফা এবং সিরিয়া দুটি ভিন্ন রাষ্ট্র ছিল, না একটি খেলাফত ও একক সাধনের শাসনের অধীনে ছিল?কোন অভিযানের পেছনে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি প্রশ্ন কি শুধু তখনই আসে যখন কেন্দ্র থেকে বাহিনী প্রেরণ করা হয়?কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও গভর্নর এবং সেনাপ্রধানদের প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান ও প্রেরন কি কেন্দ্রকে সেই ঘটনায় অন্তর্ভুক্ত রাখেনা? হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর হত্যার দায় ইয়াজিদের উপর কি শুধু তখনই বর্তাবে যখন এটি প্রমাণিত হবে যে, সে সিরিয়া থেকে ষাট অথবা সত্তর হাজারের সেনা সদস্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিল?হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর ছোট্ট কাফেলার বিপরীতে কুফানগরীতে তখন উমাইয়া খেলাফতের হাজার হাজার

সেনাবাহিনী প্রস্তুত ছিল কেন্দ্রের আদেশ পালনের জন্য।উপস্থিত এই বাহিনী যথেষ্ট ছিল। সিরিয়া থেকে বিশেষ বাহিনী প্রেরণের কোন প্রয়োজন ছিল না।এই ধরণের বোকামিসুলভ জুলটি দিয়ে কীভাবে ইয়াজিদের পক্ষবলাম্বন করা হয়? সত্যি ভাবার বিষয়!

ইয়াজিদের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীর বিদ্রোহ:

কারবালার ঘটনার পর মুসলিমবিশ্বের চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল। সবচেয়ে বেশি ছিল হিজাজে যেখানে একদিকে মক্কায় ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিআল্লাহু আনহুর মত সমরনায়ক, যিনি তখনো ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করেননি অপরদিকে মদিনার অধিবাসী যারা নবীপরিবারের পাগল প্রেমিক ছিলেন, এই হিজাজের প্রায় অধিকাংশই শুরু থেকে ছিলেন ইয়াজিদের বিরোধী। মন থেকে তাকে শাসক হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না তারা। কারবালার ঘটনা তাদের মনে আগুন ধরিয়ে দিল যদিও ইয়াজিদ কারবালায় বেঁচে যাওয়া সাইয়েদদের সাথে ভালো ব্যবহার করছিল এবং হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর ছেলে আলি ইবনে হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু কে খুব সম্মান এ মর্যাদা দিয়েছিল, কিন্তু মদিনাবাসীরা হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের ব্যাপারই ইয়াজিদের নীরবতা দেখে এটা ভাবতে বাধ্য হয়েছিল যে এই ঘটনার মূল হোতা ইয়াজিদই। তাছাড়া ইয়াজিদের এসব আচরণের কারণে মদিনা বাসীদের মনে নবীপরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনেক আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠেছিল । যার কারণে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. আলি ইবনে হুসাইনকে বলেছিলেন, যদি আমাকে আপনার কোন প্রয়োজন পড়ে তাহলে অবশ্যই বলবেন। তখন উত্তরে তিনি বলেন আসলে তেমন কোন প্রয়োজন আপাতত নেই। এরপর মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা,. বলেন, আপনি রাসুল (সা.) এর তলোয়ারটা আমাকে দিয়ে দিন। নয়তো আশঙ্কা আছে জালেমেরা আপনার থেকে তা নিয়ে নেবে। আল্লাহ শপথ আমার জীবন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমি তার কাছেধারেই কাউকে পৌঁছাতে দেব না।

ইয়াজিদের কাছে মদিনার প্রবীণ ব্যক্তিদের আগমন :

৬১ হিজরীর মহররম মাসে কারবালার ঘটনা ঘটেছিল। এরপর সাইয়েদ বংশের বাকি সদস্যদের কাফেলা ইয়াজিদের কাছে পৌঁছেন। ইয়াজিদ তাদেরকে নিরাপদ ও সম্মানে মদিনায় পাঠিয়ে দিল। এরপর ৬১ হিজরির বাকি দিন এবং ৬২ হিজরীর পূর্ণ বছর সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথেই পার হলো। এ সময় কোথাও কোন বিদ্রোহ ছিল না। আফ্রিকা,খোরাসান ও বেলুচিস্তানে জেনারেলদের অধিপত্য চলতে থাকল। ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কিছু গভর্নর ও পরিবর্তন হলো এবং মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. এর সাথে সমঝোতা তৈরি অথবা তার ওপর অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করল।

সেই সাথে ইয়াজিদ কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনায় নিজেকে ভরাক্লান্ত হিসেবে উপস্থাপনা ও বিশ্বাস করানো সব রকম চেষ্টা চালু রাখল। সেজন্য ইয়াজিদ হযরত আলী রাঃ পুত্র মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে দাওয়াত দিলো, রাজনীতির প্রতি যার সামান্য আগ্রহ ছিল না। ইয়াজিদের আহবানে তিনি সাড়া দিলেন। যদিও তার ছেলে আব্দুল্লাহ আশঙ্কার কারণে নিষেধ করেছিলেন। ইয়াজিদ মোহাম্মদ ইবনে হানাফিকে পেয়ে খুব সম্মান করলো এবং তাকে প্রভাবিত করার জন্য তার কাছে কখনো ফিকাহ কখনো কুরআনের বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করত।

কারবালার ওই ঘটনার প্রায় দুই বছর পর ৬৩ হিজরী শুরুর দিকেই ইয়াজিদ মদিনার গভর্নর উসমান ইবনে মোহাম্মদকে এই নির্দেশ দিল যে, সে যেন সেখানকার নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একটি দল শামে পাঠায়। ইবনে মোহাম্মদ ইয়াজিদের হুকুম অনুযায়ী কাজ করল। মদিনা নেতৃস্থানীয়দের একটি দল ইয়াজিদের মেহমান হলো। এই কাফেলায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর,আব্দুল্লাহ ইবনে হানজালা, মাআকিল ইবনে সিসান, আব্দুল ইবনে আমর, ইবনে হিয়াম, মুনযির ইবনে যুবাইর, আব্বাস ইবনে সাহাল, এবং উসমান ইবনে আতা প্রমুখ (সাহাবি ও তাবেয়ি) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইয়াজিদ তাদের সাথে দশ দিন পর দেখা করতে এলো এবং এসে তার বিলম্ব হওয়ার ওজর পেশ করলো, আসলে আমার পায়ের ব্যথা দিন দিন বেড়েই চলেছে। একটা সামান্য মাছি বসলেও মনে হয় পায়ে পাহার উঠেছে।

এরপর সে তাদের সাথে খুব সম্মানজনক আচরণ করল এবং প্রচুর হাদিয়া তোহফা দিয়ে বিদায় জানালো।

ইয়াজিদ আব্দুল ইবনে হানজালা রা. এর কাছে ১ লাখ দিরহাম হাদিয়া পেশ করল এবং তার আট জন ছেলেকে ১০ হাজার দিরহাম করে হাদিয়া দিলো। মুনযির ইবনে আওয়ামকে হাদিয়া দিল ১ লাখ দিরহাম। আর অন্যদের যে যা চাইলো তৎক্ষণাৎ তাকে তা দিয়ে দিলো। কিন্তু তাই বলে তারা থেমে যাননি বরং সেখান থেকে একরাশ ঘৃণা নিয়ে মদিনা ফিরে এলেন এবং এসেই ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা দিলেন। তারা শাম থেকে এটা জেনে এলেন যে ইয়াজিদ নামাজ পরিত্যাগ করে এবং অনেক কবিরা গুনাহে লিপ্ত।

এই সকল ব্যক্তির অবস্থানের কথা যেসব বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেটা সনদের দিক থেকে তুলনামূলক দুর্বল হওয়ার কারণে কিছুটা আপেক্ষিক তবে সহি বর্ণনা এবং মুতাওয়াতিরভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, তারা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং ইয়াজিদের হুকুমত ধ্বংসের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এ থেকে এ কথাই বুঝা যায়, যেসকল সাহাবী ও তাবেয়ি বিদ্রোহ করেছিলেন, তাদের কাছে মূলত ইয়াজীদের কবিরা গুনাহে লিপ্ত থাকার বিষয়টা স্পষ্ট ছিল।

ইয়াজিদের সময়কাল ও তার সারকথা :

ইয়াজিদের রাজত্বের প্রথম দিন থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল, সেসবের বিস্তারিত বিবরণ পিছনের পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচিত হয়েছে। তবে তার সারাংশ হলো এই:

হযরত মুয়াবিয়া রা. উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক সামনে রেখে নেক নিয়তে ইয়াজিদকে নিজের স্থল ভিত্তি করেছিলেন।

ইয়াজিদ খলিফা হওয়া পর্যন্ত তার থেকে আপত্তিকর কিছু প্রকাশ পায়নি যা পরে প্রকাশ হয়েছিল। মুফতি তাকি উস্মানি লিখেছেন, নিঃসন্দেহে হযরত মুয়াবিয়া রা. এর যুগে ইয়াজিদের পাপাচার প্রকাশ পাওয়ার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। সেই কারণেই ইয়াজিদকে স্থলভিত্তিক করা ও শাসক বানানো বৈধতার সীমারেখার ভেতরেই ছিল। যদিও উম্মতের মাঝে তখন তার চেয়ে অনেক যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল মুফতি তাকি উসমানী লিখেছেন ইয়াজিদকে তো খেলাফতের উপযুক্ত মনে করা যায় ; কিন্তু তখন উম্মতের মাঝে এমন লোকদের কমতি ছিল না যারা দ্বীনদারী তাকওয়া

পরহেজগারী এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ইয়াজিদের চেয়ে অনেক উচ্চ অবস্থানে ছিলেন।

ইয়াজিদের ক্ষমতায় বসার পর হযরত হুসাইন রা. এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. শরিয়তের সংরক্ষণ এবং ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে ইয়াজির হাতে বায়াত গ্রহণ করেননি। সেই সাথে ইয়াজিদের ক্ষমতা যেন প্রতিষ্ঠিত না হয় সেজন্য তারা আমৃত্যু চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আর অন্যান্য সাহাবি শরীয়তের অপরাপর দলিলের উপর ভিত্তি করে ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করে নেন। যদিও বাস্তবতে শামের অধিবাসী ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল না।

হযরত মুয়াবি এবং ইয়াজিদের সময় কালেও হযরত হুসাইন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা. এর মতাদর্শ ছিল যে, পৈত্রিক ক্ষমতা ইসলামি শুরাভিত্তিক শাসনের পরিপন্থি। এজন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা এখন সংশোধনযোগ্য এবং হযরত আবু বক্কর রা. হযরত ওমর রা. এর খিলাফতের আদলে গড়ে তোলা অপরিহার্য। এটা তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ এবং ইজতিহাদ ফতোয়া ছিল।

হযরত আব্দুল ইবনে ওমর রা. এবং হযরত আব্দুল ইবনে আব্বাস রা. এর কাছেও সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা সেটাই ছিল,যা হযরত হুসাইন রা. এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. ছিল। কিন্তু তাদের সংশোধনের চেয়ে বেশি দৃষ্টি ছিল বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের প্রতি। সেজন্য তখনকার হুকুমত এবং শাসন ব্যবস্থা যেহেতু বৈধতার সীমারেখাতেই ছিল তাই তারা সেটা গ্রহণ করাকে কল্যাণকর মনে করেছেন।

ইয়াজিদের পাপাচারের প্রসিদ্ধ তার খলিফা হওয়ার পর হয়েছিল। হযরত রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহমতুল্লাহ বলেছেন, হযরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজিদকে যখন খলিফা মনোনীত করেছিলেন তখন সে ভালো অবস্থায় ছিল। এরপর এখানে তিনি লিখেছেন, ইয়াজিদ প্রথমে ভালই ছিল কিন্তু পরবর্তীতে যখন ক্ষমতা পেয়েছে খারাপ হয়ে গেছে।

মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে যারা ইয়াজিদের পাপাচারের বিষয়টা নিশ্চিতভাবে জানতো তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাদের ফিকহি মাসআলা অনুযায়ী ফাসিকের শাসন মেনে নেওয়া ছিল অবৈধ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ওয়াজিব। তাদের সামনে নবীজির সেই সব হাদিস ছিল যেগুলোতে অন্যায়কে হাতের শক্তি দ্বারা প্রতিহত করা আদেশ ছিল। এইসব মনিষী আসলে মুজতাহিদ ছিলেন। তাই তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কোন অধিকার কারো নেই।

অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ি ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন সেসব হাদিসের ভিত্তিতে, যাতে নবীজি খলিফার বাইয়াত ছিন্ন করতে নিষেধ করেছেন।; সে জালেম হোক বা ফাসেক অবশ্যই কতক এমনও ছিলেন, যাদের কাছে ইয়াজিদের পাপাচার প্রমাণিত ছিল না। যেমন :মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া রহ.।

ইয়াজিদের ব্যাপারে কুফরি ও ব্যভিচারের অপবাদ কিছু দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে এসেছে। সেগুলো আসলে সঠিক নয়। তবে ইয়াজিদের ফিসকের ব্যাপারে সকল আলেমই একমত পোষণ করেছেন এবং সেকারণেই মদিনার প্রবীণ সাহাবীগণ তার বিরোধে বিদ্রোহ করেছিলেন। কারণ তারা এসবের পূর্ণ ও পাকা প্রমান না নিয়ে নিছক ধারণার বশবর্তী হয়ে মাঠে নামেননি। তাছাড়া ইয়াজিদের জুলুমটাই ছিল এক ধরনের ফিসক। ইয়াজিদের ক্ষমতাশালী হওয়ার পর কিছু অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যার ফলে অনেক গভর্নর, রাজনৈতিক এবং সাধারণ জনগণের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এসবের সাথে হযরত মুয়াবিয়ার কোন যোগসূত্র ছিল না। কারণ তিনি তো গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ জানতে না। এসবই হয়েছিল তার ইন্তেকালের পর।

উপসংহার :

কারবালার ইতিহাস কেবল এক মর্মান্তিক যুদ্ধের বিবরণ না বরং এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়,মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্য এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের এক চিরন্তন দলিল।

বিজয় বনাম আত্মত্যাগ : বাহ্যিক দৃষ্টিতে কারবালায় ইয়াজিদ বাহিনীর সামরিক বিজয় হলেও আদর্শিকভাবে ইমাম হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর আত্মত্যাগ বিজয়ী হয়েছে তিনি তার ৭২ জন সংগীসহ নিজের জীবন উৎসর্গ করে ইসলাম ও মানবতার মূলনীতি রক্ষা করেছেন।

অন্যায়য়ের বিরুদ্ধে অবস্থান : ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের মতো স্বৈরাচারী ও দুর্নীতি পরায়ণ শাসনের কাছে বায়াত গ্রহণ করেননি। যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরকাল মাথা উঁচু করে থাকার শিক্ষা দেয়।

নৈতিকতার জয় :কারবালা আমাদের শেখায় যে নিজেদের জান-মাল এবং পরিবারকে কুরবানী দিয়েও সত্যের পথে অটল থাকতে হয়।
ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন : এই মর্মান্তিক ঘটনা মুসলিম উম্মার মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব ফেলে যা শিয়া ও সুন্নি মতাদর্শের পার্থক্যে বড় ভূমিকা রাখে।
চিরন্তন বার্তা : কারবালার বার্তা হল ন্যায় ও আদর্শের পথে চলতে গিয়ে মৃত্যু হলেও সেই আত্মত্যাগ অমর থাকে।
মূলত কারবালা প্রতিটি যুগের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরার এক জীবন্ত প্রতীক।

রেফারেন্স :

১/কারবালা বাহিনী ও তার প্রকৃত স্বরূপ -মুফতি লুৎফার রহমান ফরায়েজি

২/মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস -মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল রেহান